যেরকম টুনটুনি সেরকম ছোটাচ্চু - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

উৎসর্গ

সাদাতউদ্দীন আহমেদ এমিল যে
আমার টুনটুনি এবং ছোটাচ্চু
বইয়ের ছবি ঐঁকে দেয় বলে আমি
এখনও এই বইগুলো লেখার উৎসাহ পাই!

ভূমিকা

যখন টুনটুনি এবং ছোটাচ্চুকে নিয়ে প্রথম লিখতে শুরু করেছিলাম তখন ভেবেছিলাম এগুলো হবে ছোটদের জন্য এক ধরনের ডিটেকটিভ গল্প। লিখতে লিখতে আবিষ্কার করেছি সেগুলো সবসময় পুরোপুরি ডিটেকটিভ গল্প থাকেনি। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের যে বিষয়গুলো নিয়ে সমস্যা হয় কীভাবে কীভাবে সেগুলো গল্পের মাঝে চলে আসতে শুরু করেছে। এতে আমি যে খুব বেশি বিচলিত হয়েছি সেটা বলা যাবে না- কাউকে তো মাথার দিব্যি দিয়ে বলিনি গল্পগুলো সবসময়েই খাঁটি ডিটেকটিভ গল্প হবে এবং সেখানে কোনো উনিশ বিশ হবে না। একটুখানি উনিশ বিশ হলেই কী আর না হলেই কী?

কখনোই ভাবিনি যে আমি একই চরিত্র দিয়ে একাধিক বই লিখব। যেহেতু লেখা হয়েই গেছে এখন দেখতে হবে কতোদিন সেটা চালিয়ে যাওয়া যায়। আমার দিক থেকে বলতে পারি যতদিন পাঠকের আগ্রহ থাকবে আমি চেষ্টা করে যাব।

বাকিটুকু নির্ভর করবে টুনটুনি আর ছোটাচ্চুর ওপর-তারা সবাইকে নিয়ে বারবার আসতে রাজি হয় কী না সেটাই মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন!

মুহম্মদ
বনানী,
ঢাকা

জাফর

ইকবাল

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

১. এক সেট গয়না

দরজায় টুংটাং শব্দ শুনে টুনি দরজা খুলে দেখে দরজার সামনে ফারিহা দাঁড়িয়ে আছে। ফারিহা তার মাথার চুল ছোট করে কেটে ফেলেছে, সেজন্যে আজকে তাকে দেখতে অন্য রকম লাগছে। টুনি খুশি খুশি গলায় বলল, “ফারিহাপু, তোমাকে দেখতে আজকে কী সুইট লাগছে!”

ফারিহা তার ছোট ছোট চুলের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে হাসি মুখে বলল, “ভেবেছিলাম ন্যাড়া করে ফেলব। শেষ পর্যন্ত আর করলাম না।”

টুনি বলল, “কেন করলে না ফারিহাপু?”

“মনে হলো আমার মাথার চাঁদিটা ঢেউ ঢেউ। দেখতে কেমন লাগবে সেটা ভেবে আর ন্যাড়া করলাম না।

টুনি হি হি করে হেসে বলল, “মাথার চাঁদি কখনো ঢেউ ঢেউ হয় না ফারিহাপু।”

“হয়, হয়!” বলে ফারিহা ভেতরে ঢুকে একটা সোফায় বসে বলল,
“শাহরিয়ার আছে?”

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, “আছে। তুমি বসো ফারিহাপু, আমি
ডেকে দিচ্ছি।

ফারিহা আবার তার চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বলল, “আমার চুল
দেখে শাহরিয়ার কী বলবে মনে হয়?”

টুনি মুখ টিপে হাসল, বলল, “ছোট্টাছু ভান করবে যে সে লক্ষই
করেনি!”

ফারিহা মাথা নাড়ল, বলল, “আমারও তাই মনে হয়। দেখি, ডেকে
আনো দেখি।”

ছোট্টাছু এসে ফারিহাকে দেখে একটুখানি চমকে উঠল কিন্তু
সত্যি সত্যি ভান করল যে সে ফারিহার ছেলেদের মতো করে
কাটা চুলটা আলাদা করে লক্ষ করেনি। খানিকটা উদাস মুখ করে
বসে রইল। তখন ফারিহা নিজেই জিজ্ঞেস করল, “আমার এই
চুলের স্টাইলটা তোমার কেমন লাগছে শাহরিয়ার?”

ছোট্টাছু বলল, “সত্যি করে বলব?”

“সত্যি করেই তো বলবো।”

“তোমাকে দেখতে একটা ছেলের মতো লাগছে। শুধু ছেলে না,
কেমন যেন গুল্লা গুল্লা টাইপ।”

ফারিহা হি হি করে হেসে নিজের হাতে নিজে কিল দিয়ে বলল,
“তুমি ঠিক বলেছো। শুধু যে দেখতে গুল্লা গুল্লা লাগছে তা না,
নিজেকে কেমন জানি মনেও হচ্ছে গুল্লা গুল্লা।”

ছোটাচ্চু একটু ভয়ে ভয়ে ফারিহার দিকে তাকাল, বলল, “সত্যি?”

“হ্যাঁ সত্যি। মনে হচ্ছে কারো শার্টের কলার ধরে একটা ঝাঁকুনি দেই। কাউকে ঘুষি মারি। কাউকে গালাগাল করি।”

ছোটাচ্চু আরও ভয়ে ভয়ে বলল, “গালাগাল? ঘুষি?”

“হ্যাঁ।” বলে ফারিহাপু ছোটাচ্চুর হাত ধরে টান দিয়ে বলল, “চল।”

“কোথায়?”

“দেখি, মারামারি করার জন্য কাউকে পাওয়া যায় নাকি।”

ফারিহাপু সত্যি সত্যি মুখটা কেমন জানি ভয়ঙ্কর করে এক হাত দিয়ে অন্য হাতে আস্তে আস্তে ঘুষি মারতে লাগল।

ছোটাচ্চু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “দাঁড়াও, শার্টটা একটু বদলে আসি।”

ফারিহা বলল, “ঠিক আছে, যাও।”

ছোটাচ্চু ঘর থেকে বের হতেই ফারিহাপু খিলখিল করে হাসতে লাগল। টুনির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, “দেখেছো? দেখেছো? তোমার ছোটাচ্চু সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেছে।”

টুনিও হাসল, বলল, “হ্যাঁ। আর তুমি বলেছো খুব জোর দিয়ে। ছোটাচ্চুকে যে যেটাই বলে সেটাই বিশ্বাস করে।”

ফারিহা মাথা নাড়ল, বলল, “সেইটা ঠিক।”

টুনি এবারে একটু ভয়ে ভয়ে বলল, “কিন্তু তুমি কি সত্যি সত্যি এখন কারো সাথে মারামারি করতে যাবে?”

ফারিহা মাথা চুলকে বলল, “বলে যখন ফেলেছি, তখন তো করতেই হবে। মারামারি না হোক একটু ঝগড়া-ঝাঁটি তো করা দরকার। কার সাথে করা যায়?”

টুনি বেশ খানিকটা দুশ্চিন্তা নিয়ে ফারিহার দিকে তাকিয়ে রইল। ফারিহাপু পারে না সেরকম কাজ মনে হয় দুনিয়াতে নাই।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ একসময় ফারিহা বলল, “টিশ টিশ টিশুম।”

ছোটাচ্চু ভুরু কুঁচকে বলল, “টিশ টিশ টিশুম মানে কী?”

“কোনো মানে নাই। “

“তাহলে?”

“তাহলে কী?”

“তাহলে এটা বলছো কেন?”

ফারিহা বলল, “কী আশ্চর্য, যে কথাটার মানে নাই সেই কথা বলা যাবে না?”

“আগে তো বলতে না। সেই জন্যে বলছি।

ফারিহাপু তখন হঠাৎ ব্রেক করে তার গাড়ি থামাল। ফারিহাপুর গাড়িতে উঠলে সবাইকে সিট বেল্ট লাগাতে হয়, তা না হলে নির্ঘাত ছোটাচ্চু সামনের ড্যাশ বোর্ডে একটা ধাক্কা খেত। ছোটাচ্চু একটু অবাক হয়ে বলল, “কী হলো, থামালে কেন? “

“চলো।”

“চলো? কোথায়?”

“চিনতে পারছে না কোথায়?”

জায়গাটা তখন ছোটোচ্চু চিনতে পারল। এইখানে তার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস ছিল।

ছোটোচ্চু মাথা বের করে তাকিয়ে দেখল, এখনও অফিসের সাইনবোর্ডটা আছে, তার মানে তার ডিটেকটিভ এজেন্সিটা উঠে যায় নাই। সরফরাজ কাফী তার অফিসটা দখল করে তাকে বের করে দিয়েছে কথাটা চিন্তা করলে আগে রাগে ছোটোচ্চুর মাথা গরম হয়ে যেত। আজকাল আর হয় না। ব্যাপারটা চিন্তা করলে তার কাছে এখন পুরো ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর মনে হয়।

ছোটোচ্চু ভুরু কুঁচকে বলল, “এখানে থেমেছো কেন?”

“তোমার সরফরাজ কাফীকে একটু কচলে আসি।”

“কচলে আসবে? কচলে আসা আবার কী রকম কথা?” ছোটোচ্চু একটু অবাক হয়ে ফারিহার দিকে তাকাল। ফারিহা হঠাৎ করে এরকম অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে।

ফারিহাপু এক হাত দিয়ে অন্য হাতের তালুতে ঘুষি দিতে দিতে বলল, “সরফরাজ কাফী মানুষটা এত বড় একটা দুই নশুরি কাজ করেছে, তারপরেও তার সাথে একবারও কেউ কোনো কথা বলল না, একটু ডলে দিল না, এটা তো হতে পারে না।”

ছোটোচ্চু বলল, “তুমি কি এখন তার সাথে ঝগড়া করতে যাচ্ছে?” ফারিহাপু ফোঁস করে বলল, “আগে যাই। দেখি, ঝগড়া না মারামারি ঠিক কোনটা করা যায়।”

ছোটাচ্চু গম্ভীর হয়ে বলল, “দ্যাখো ফারিহা—”

ফারিহা হাত নেড়ে ছোটাচ্চুর কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, “তুমি আসো আমার সাথে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।” কথা শেষ করে ফারিহা ছোটাচ্চুর হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির দরজা খুলে অনেক দিন পর ছোটাচ্চু ফারিহাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। আগে যেখানে রঞ্জনা বসত এখন সেখানে আরেকজন মেয়ে বসে আছে। মাথার চুলগুলো উঁচু করে বাঁধা, মুখে কড়া মেকআপ, ঠোঁটে কটকটে লাল রং। রঞ্জনা সব সময় শাড়ি পরে থাকত। এই মেয়েটা বিদঘুটে রঙের একটা সালোয়ার- কামিজ পরে আছে। মেয়েটির সামনে বসে একজন বয়স্কা মহিলা তার কথা বলছেন। ছোটাচ্চু এবং ফারিহাকে ঢুকতে দেখে দুজনেই তাদের দিকে ঘুরে তাকাল। মেকআপ করা মেয়েটি দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করে বলল, “ওয়েলকাম টু দ্য আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি। আপনাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি?”

ফারিহা বলল, “আমরা সরফরাজ কাফীর সাথে দেখা করতে এসেছি।”

মেয়েটি বলল, “কাফী স্যার তো নেই। উনি সবসময় এখানে আসেন না। আপনারা কী এপয়েন্টমেন্ট করে এসেছেন?”

ফারিহা মাথা নাড়ল, “না, এপয়েন্টমেন্ট করে আসি নাই।”

“আপনাদের কেসটা আমাকে বলতে পারেন, আমি দেখি কী করতে পারি।”

সামনে বসে থাকা মহিলা একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, “আমার কেসটা আগে শেষ করে দেন।”

মেকআপ করা মেয়েটা মহিলার দিকে তাকিয়ে আবার দাঁত বের করে হাসার মতো একটা ভয়ঙ্কর ভঙ্গি করে বলল, “ম্যাডাম, সব কাস্টমার আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই সবাইকে আমাদের সমানভাবে দেখতে হবে।”

মহিলা বিরক্ত হয়ে বললেন, “সেটা দেখতে চান দেখেন, কিন্তু আমার কাজটা করে দিতে পারবেন কি না বলেন।”

“অবশ্যই পারব। দ্য আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি পারে না এমন কোনো কাজ নেই। ঐ যে পিছনে তাকিয়ে দেখেন, আমাদের বড় বড় কেসগুলোর কথা আমরা বোর্ডে টানিয়ে রেখেছি। কিন্তু অ্যাকশান প্ল্যানটা কী হবে সেটা ঠিক করতে হবে। এডভান্স পেমেন্টের একটা ব্যাপার আছে-’

সামনে বসে থাকা মহিলা এবারে আরেকটু বিরক্ত হলেন। বললেন, “কী মুশকিল! ঘুরে-ফিরে আপনাদের শুধু একটা কথা! পেমেন্ট! পেমেন্ট! আরে বাবা, আমি কি না করেছি যে পেমেন্ট করব না?”

ছোট্টাচ্চুর লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, এটি এখন আর তার ডিটেকটিভ এজেন্সি নয়, কিন্তু তবু সে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। হেঁটে হেঁটে তখন ঘরের অন্য মাথার বোর্ডে ঝোলানো আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির বড় বড় কেসগুলো দেখতে গেল। তাকে বের করে দেওয়ার পর সরফরাজ কাফী কী কী কেস করেছে দেখার জন্য তার বেশ কৌতূহল হলো। তবে বোর্ডে ঝোলানো কেসগুলো দেখে ছোট্টাচ্চু বেশ অবাক হলো, এখানে নতুন একটি কেসও নেই। ছোট্টাচ্চু এখানে থাকার সময় যে

কেসগুলো করেছে সেগুলোর কথাই লেখা। কী আশ্চর্য! সরফরাজ কাফী এতদিন তাহলে করেছে কী?

পাশে একটা শেলফ, সেখানে অনেকগুলো মগ, টি-শার্ট এবং চাবির রিং। সেগুলোর উপরে বড় বড় করে লেখা ‘দি আলটিমেট ডিকেটটিভ এজেন্সি’। তার এক সময়কার ডিটেকটিভ এজেন্সি কি এখন মগ আর টি-শার্ট বিক্রি করে চলছে? কী আজব!

ঠিক তখন ফারিহার গলা শুনে ছোট্টাচ্চু ঘুরে তাকাল। ফারিহা মেকআপ করা মেয়েটার সাথে কথা বলছে। সরফরাজ কাফী যেহেতু নেই, সে তার রাগ ঝাড়ার কোনো মানুষ পাচ্ছে না তাই এখন সে কী করবে বুঝতে পারছে না। ফারিহা কী বলছে শোনার জন্য ছোট্টাচ্চু কান খাড়া করল। শুনল ফারিহা জিজ্ঞেস করল, “আপনারা কি সব ধরনের কেস নেন?”

মেকআপ করা মেয়েটা বলল, “অবশ্যই! অবশ্যই নেই।”

“একজন মানুষ যদি আরেকজনের কোম্পানি দখল করে নেয় সেটার তদন্ত করতে পারবেন?”

এই মেয়েটি নিশ্চয়ই নতুন। সরফরাজ কাফী যে ছোট্টাচ্চুর দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি দখল করে নিয়েছে সেটা নিশ্চয়ই জানে না। তাই খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, “অবশ্যই তদন্ত করতে পারব। কোম্পানি দখল করে নেয়া তো ছেলে খেলা নয়। ঘাঘু ক্রিমিনালরা ছাড়া এটা পারে না। আপনি শুধু বলেন, আমরা আমাদের এজেন্টদের লাগিয়ে দেব, দুই সপ্তাহে তদন্ত করে সব বের করে আনবে। ক্রিমিনালদের সোসাইটিতে ঘুরে বেড়ানোর কথা নয়। ক্রিমিনালরা থাকবে জেলখানার ভিতরে—”

“গুড!” ফারিহা এবারে খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, “একটা কাগজে লেখেন। কোম্পানিটার নাম হচ্ছে দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি।”

ছোটাচ্চু দূর থেকে দেখল মেকআপ করা মেয়েটার চোয়াল কটাস করে ঝুলে পড়েছে। ফারিহা সেটা খেয়াল করল না, টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, “কোম্পানিটার আসল মালিক ছিল শাহরিয়ার হাসান। ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে।”

মেকআপ করা মেয়ে এবং সামনে বসে থাকা মহিলা দুইজনেই মাথা ঘুরিয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল। ছোটাচ্চু আর কী করবে? দূর থেকে মুখটা একটু হাসি হাসি করে হাত নেড়ে দিল।

ফারিহা বলল, “আর যে ক্রিমিনালটা শাহরিয়ার হাসানের কোম্পানিটা দখল করেছে তার নাম হচ্ছে সরফরাজ কাফী।

মেকআপ করা মেয়েটার ঝুলে থাকা চোয়াল কটাস করে একবার বন্ধ হয়ে আবার খুলে গেল। তারপর খুলতে লাগল এবং বন্ধ হতে লাগল। ফারিহা সেটা খেয়াল করল বলে মনে হলো না। এক হাত দিয়ে অন্য হাতের তালুতে ঘুষি দিতে দিতে বলল, “ধরা যাবে তো সরফরাজ কাফীকে? জেলখানার ভাত খাওয়ানো যাবে তো? কমপক্ষে এক বেলা? কিছু এডভান্স কি করে যাব?”

মেকআপ করা মেয়েটি কী বলত কে জানে, কিন্তু ঘটনাটা আরও জমজমাট করার জন্য ঠিক তখন বাইরের দরজা খুলে গেল এবং সরফরাজ কাফী এসে ঢুকল। ছোটাচ্চু দেখল সরফরাজ কাফী ঠিক আগের মতোই আছে। আগের মতোই পরনে সুট এবং টাই। মাথার চুল মনে হয় আরও একটু পাতলা হয়েছে, আগের মতোই মাথার মাঝখানে সিঁথি করে চুল দুই ভাগে ভাগ করে চাঁদিটা ঢেকে রেখেছে। তার মুখে আগের মতোই একটা তেলতেলে ভাব।

সরফরাজ কাফীকে দেখে মেকআপ করা মেয়েটি প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সরফরাজ কাফী ছোট্টাচ্চুকে তখনো দেখেনি, তার মুখের তেলতেলে হাসিটাকে পিছলে একটা হাসি বানিয়ে জিজ্ঞেস করল,

“গুড মর্নিং লিন্ডা। আমাদের কি নূতন কোনো কেস এসেছে?”

মেকআপ করা মেয়েটা বলল, “না স্যার-মানে স্যার, ইয়ে বলছিলাম কী, মনে হয় একটা গোলমাল-মানে স্যার ইয়ে—যেটা বলছিলাম কিন্তু মানে ইয়ে—” কথাটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই এবং কথাটা শেষও করতে পারল না, মাঝখানে থেমে গিয়ে লিন্ডা নামের মেকআপ করা মেয়েটা মাছের মতো খাবি খেতে লাগল। সরফরাজ কাফীর কিছু একটা সন্দেহ হলো। তখন মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছোট্টাচ্চুকে প্রথমবার দেখতে পেল এবং সাথে সাথে তার মুখটা কেমন জানি শক্ত হয়ে গেল। তার চোখে প্রথমে বিস্ময়, তারপরে সন্দেহ এবং সবশেষে ভয় এসে ভর করল।

ছোট্টাচ্চু হাসি হাসি মুখে বলল, “অনেক দিন আপনার সাথে যোগাযোগ নেই। কেমন আছেন সরফরাজ সাহেব? আপনার কফি মগ, টি-শার্ট আর কী-রিং কেমন বিক্রি হচ্ছে?”

সরফরাজ কাফী কোনো উত্তর দিল না, চোখ বড় বড় করে ছোট্টাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল। ফারিহা আগে কখনো সরফরাজ কাফীকে দেখেনি তাই প্রথমে চিনতে পারেনি। ছোট্টাচ্চুর কথা শুনে সে বুঝতে পারল এই সেই দুই নম্বর সরফরাজ কাফী। সে তড়াক করে লাফ দিয়ে বলল, “ও! আপনিই সেই মানুষ! অনেক দিন থেকে আমি আপনাকে খুঁজছি।”

ফারিহা এক হাতের তালুতে অন্য হাত দিয়ে ঘুষি দিতে দিতে সরফরাজ কাফীর দিকে এগিয়ে যায়। আর সরফরাজ কাফী প্রায়

লাফিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে যায়। আরেকটু হলে একটা চেয়ারের সাথে পা বেঁধে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনোমতে নিজেকে সামলে নিল। ফারিহা একেবারে বিপজ্জনকভাবে খুব কাছাকাছি গিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “আমি শাহরিয়ারের কাছে আপনার দুই নম্বর কাজকর্মের কথা শুনেছি কিন্তু আপনাকে কখনো দেখি নাই। আপনি দেখতে কেমন হতে পারেন, সেইটা নিয়ে আমার মনের মাঝে একটা কল্পনা ছিল। আপনি জানেন, আপনার চেহারা আমার কল্পনার সাথে হুবহু মিলে গেছে। একেবারে হুবহু!”

সরফরাজ কাফী কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলতে পারল না। গলা দিয়ে শুধু বিদঘুটে একটা আওয়াজ বের হলো। ফারিহা আরেকটু এগিয়ে যায়, সরফরাজ কাফী আরও অনেকটুকু পিছিয়ে যায়। ফারিহা হঠাৎ মুখটা কঠিন করে কেমন যেন হিসহিস শব্দ করে বলল, “অনেক দিন থেকে ভাবছি ব্যাপারটা আপনার সাথে হেস্ট নেস্ট করতে আসব। শাহরিয়ারকে সোজা মানুষ পেয়ে তার কোম্পানি দখল করে নিয়েছেন। সে ভালোমানুষ, কিছু বলে নাই। আমি ভালো মানুষ না- আমি-”

ফারিহা কী ধরনের মানুষ বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই ছোটাছু প্রায় লাফ দিয়ে এসে ফারিহার হাত ধরে তাকে টেনে সরিয়ে নেয়। রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে তাকে দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস থেকে বের করে নিতে নিতে বলল, “কী শুরু করেছে ফারিহা? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? চলো, চলো বের হও এখান থেকে।”

ফারিহা হুঙ্কার দিয়ে বলল, “ভালো হবে না শাহরিয়ার! আমাকে ছেড়ে দাও। কোন মানুষকে কীভাবে সাইজ করতে হয় তুমি জানো না

“আমার জানতে হবে না। চলো, চলো। বের হও।” বলে ছোট্টাচ্চু ফারিহাকে দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস থেকে রীতিমতো টেনে বের করে নিয়ে এলো।

গাড়িতে উঠে ফারিহা স্টিয়ারিং হুইলে দুই হাত রেখে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে লাগল। ছোট্টাচ্চু বলল, “তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে কেউ কথা বলে?”

“আমি বলি।”

“বলা ঠিক না। ঝগড়া-ঝাঁটি, চেষ্টামেচি করে দুনিয়ার কোনো কাজ হয় না।”

“হয়।

“কী হয়?”

“একধরনের আরাম হয়।”

“চুলকানি হলে সেটা খামচালেও আরাম হয়। তার মানে এই না যে আমি শরীরে চুলকানি বানাব খামচানোর জন্য—”

ফারিহা বলল, “ইশ্! তুমি যে কী বাজে কথা বলতে পারো!” তারপর গাড়ি স্টার্ট করে যেই রওনা দেবে ঠিক তখন দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে বয়স্কা মহিলাটি বের হয়ে হাত

নাড়াতে নাড়াতে চিৎকার করতে লাগলেন, “দাঁড়ান, দাঁড়ান।
যাবেন না। যাবেন না। আগেই যাবেন না।”

ফারিহা তার গাড়ি থামাল। মহিলাটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে
জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে ছোটোচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল,
“আপনি সেই বিখ্যাত ডিটেকটিভ শাহরিয়ার সাহেব? এই
ডিটেকটিভ এজেন্সির আসল মালিক?”

ছোটোচ্চু একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, “বিখ্যাত ডিটেকটিভ কি না
জানি না। তবে হ্যাঁ, এই এজেন্সিটা আমি তৈরি করেছিলাম।”

“আমি আসলে আপনার কাছেই এসেছিলাম। এসে শুনি আপনি
আর এখানে কাজ করেন না।”

ছোটোচ্চু মাথা নাড়ল, কিছুই বলল না। মহিলা বললেন, “আমার
নাম রওশান আরা। আমার একটা কেস ছিল, খুবই সেনসিটিভ।
যদি একটু দেখতেন।”

ছোটোচ্চু মাথা নেড়ে বলল, “আমি আসলে ডিটেকটিভ কাজ
ছেড়ে দিয়েছি।”

“সে কী! আপনার মতো এত বড় ডিটেকটিভ যদি কাজ ছেড়ে
দেন তাহলে কেমন করে হবে?”

“আমি মোটেও বড় ডিটেকটিভ না। কিন্তু সেটা বড় কথা না।
ডিটেকটিভ এজেন্সির কাজ আর ভালো লাগে না।”

মহিলা অনুনয় করে বলল, “আমার কেসটা একটু করে দেন
প্লিজ। আপনার জন্য খুবই সহজ হবে কাজটা। একেবারে পানি
ভাত।”

ছোটাচ্চু একটু হেসে ফেলল। বলল, “কী রকম কেস?”

“আমার আলমারি থেকে আমার একটা গয়নার সেট চুরি গেছে। চাবি থাকে আমার কাছে, সেটা কেউ নিয়ে চুরি করেছে। বাসার কেউ নিশ্চয়ই নিয়েছে, কিন্তু কাকে সন্দেহ করব?”

“বাসায় কারা থাকে?”

“অনেকে থাকে। ফ্যামিলি মেম্বাররা আছে, কাজের মানুষজন আছে। কিছু আত্মীয়স্বজনও আছে।”

“কাউকে সন্দেহ করেন?”

“না। কাকে সন্দেহ করব? সবাই নিজের মানুষ। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে তাদের ভেতর থেকেই কেউ নিশ্চয়ই চুরি করেছে। খুবই দুঃখের ব্যাপার।”

ছোটাচ্চু মুখ সুচালো করে বললেন, “আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর যে আপনার বাসায় যারা আছে তাদের ভেতর থেকেই কেউ একজন চুরি করেছে?”

“জি। হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট সিওর।”

“সবাইকে একসাথে পাওয়া যাবে?”

রওশান নামে মহিলা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, “জি, পাওয়া যাবে।”

ছোটাচ্চু হঠাৎ হেসে ফেলল। মিসেস রওশান অবাক হয়ে বললেন, “হাসছেন কেন?”

“একটা খুবই সোজা উপায় আছে। নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা গল্পে এটা আছে। আপনি করবেন কী—”

ফারিহা বলল, “দাঁড়াও শাহরিয়ার। মিসেস রওশান জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে কথা বলছেন। তুমি গাড়ির সিটে বসে কথা বলছো। এভাবে হয় না। কোথাও বসে কথা বলো।”

ছোটাচ্চু বলল, “কোনো দরকার নেই। নাসিরুদ্দিন হোজ্জার টেকনিকটা খুবই সোজা টেকনিক। আমি এক মিনিটে বলে দিতে পারব। আপনি প্রথমে একটা—”

মিসেস রওশান জোরে জোরে মাথা নাড়ালেন। বললেন, “না না না। আমি নিজে কিছুই করব না। আপনাকে কষ্ট করে আমার বাসায় একটু আসতে হবে। প্লিজ, আসতেই হবে। আসতেই হবে। আপনার টেলিফোন নম্বরটা আমাকে দেন। আমি বাসায় গিয়ে সবাইকে একত্র করে আপনাকে ফোন করব। ঘণ্টখানেক সময় দেন।”

কাজেই ছোটাচ্চুকে তার ফোন নম্বর দিতে হলো। মিসেস রওশান ছোটাচ্চুর নম্বরটা নেওয়ার পর শেষ পর্যন্ত গাড়ির জানালা থেকে তার মাথা বের করলেন। ফারিয়াও শেষ পর্যন্ত তার গাড়ি স্টার্ট করতে পারল।

ঘণ্টখানেকের আগেই মিসেস রওশানের ফোন চলে এলো। ফোনে বাসার ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন। ফারিহার আপাতত কোনো কাজ নেই তাই সে ছোটাচ্চুকে সেই বাসায় নিয়ে গেল।

মিসেস রওশানের বাসাটা অনেক সুন্দর। বাসার দারোয়ান গেট খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে তাদের দুজনকে লম্বা করে সালাম দিল। মিসেস রওশান নিশ্চয়ই গেটে আগে থেকে বলে রেখেছেন। ফারিহা গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে বারান্দার সামনে থামাল। দুইজন গাড়ি থেকে নামতেই দেখল বারান্দায় মিসেস রওশান দাঁড়িয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, “আসেন, আসেন। বাড়ি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?”

ছোট্টাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, “না। অসুবিধা হয় নাই।”

“ভেতরে আসেন। ডাইনিং হলে সবাই অপেক্ষা করছে।”

ছোট্টাচ্চু জিজ্ঞেস করল “কতজন?”

“আমাকে নিয়ে সতেরোজন। “

“বেশ বড় ফ্যামিলি।”

“হ্যাঁ। বাচ্চাকাচ্চাও আছে কয়েকজন। ওদেরকে আর রাখিনি।”

“যারা সন্দেহের বাইরে তাদের রাখার দরকার নাই।”

“তবে মজা দেখার জন্য তারাও আছে।”

ছোট্টাচ্চু হাসল, বলল, “থাকার কথা।”

“আপনি কি কাজ শুরু করে দেবেন, নাকি আগে একটু চা-নাস্তা খেয়ে নেবেন?”

“কাজ শুরু করে দিই। আমার কয়েকটি জিনিস লাগবে।”

“কী লাগবে?”

“একটা ব্যাগ আর একটা বড় তোয়ালে— “

“আর কিছু?”

“আপনার চাবির গোছাটা। আর একটা টিস্যুর বাক্স। “ঠিক আছে, আমি নিয়ে আসি।”

“আমি সবার সাথে আগে একটু কথা বলব। তারপর আমি বসার ঘরে বসব। ডাইনিং রুম থেকে একজন একজন করে এখানে আসবে। আমি তাদেরকে কিছু একটা করতে বলব। তারা সেটা করে চলে যাবে। যখন সবাই শেষ হবে তখন আমি মনে হয় বলে দিতে পারব কে আপনার স্টিলের আলমারি খুলেছে।”

মিসেস রওশান একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, “আমার এখন একটু একটু ভয় লাগছে। “

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, “কেন? ভয় কেন লাগছে?”

“এখানে সবাই বাসার মানুষ, নিজেদের মানুষ, আপন মানুষ। এখন যদি দেখি এদের ভিতরে একজন আমার গয়নার সেটটা চুরি করেছে তাহলে আমার কেমন লাগবে?”

ফারিহা মাথা নাড়ল, বলল, “সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছেন।”

ছোটাচ্চু বলল, “এখনও চিন্তা করে দেখেন, আপনি কি সত্যিই জানতে চান?”

মিসেস রওশান মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ, আমি জানতে চাই।”

“ঠিক আছে। তাহলে শুরু করি।”

“চলেন।” মিসেস রওশান হাঁটতে হাঁটতে বললেন, “ডাইনিং রুমে সবাই অপেক্ষা করছে।”

ডাইনিং রুমে সবাই নিজেদের মাঝে কথা বলছিল। এক সেট গয়না চুরির আসামিকে ধরার জন্য সবাইকে একত্র করা হয়েছে সেটা নিয়ে কারও মাঝে কোনো দ্বিধা আছে বলে মনে হলো না। দেখে মনে হলো সবাই কোনো একটা ম্যাজিক শো দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। ছোট্ট আঁচু আর ফারিহা ঘরের মাঝে তোকার সাথে সাথে সবাই আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।

মিসেস রওশান যথেষ্ট বিরক্ত হলেন। বললেন, “কী হলো? একটা চোর ধরার জন্য সবাইকে একত্র করেছে। আর সবাই আনন্দে হাততালি দিচ্ছে? ব্যাপারটা কী?”

মাথায় টাক এবং মোটাসোটা একজন ভদ্রলোক বললেন, “ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছে না? ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে তোমার চোর নাই।”

মিসেস রওশান হুঙ্কার দিলেন, “আছে শওকত। তা না হলে আমার গয়নার সেট গেল কই?”

শওকত নামের মোটাসোটা ভদ্রলোক যিনি মিসেস রওশানের স্বামী, চোখ নাচিয়ে বললেন, “তোমার আলমারির চাবি তোমার কাছে থাকে। তাই গয়নার সেট তুমি নিশ্চয়ই অন্য কোনোখানে রেখে ভুলে গেছো। এখন আমাদের দোষ দিচ্ছা।”

মিসেস রওশান গলা উঁচিয়ে বললেন, “আমি তোমার মতো হাবাগোবা না যে ভুলে যাব।”

শওকত সাহেব এবার অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখলি? তোরা দেখলি? তোর আশ্মু আমাকে হাবাগোবা বলে গালি দিল।”

কমবয়সী একটা মেয়ে বলল, “বাদ দাও আব্বু। আগে চোর ধরার প্রজেক্ট শেষ হোক। যখন দেখবে আমরা কেউ আশ্মুর গয়না চুরি করি নাই তখন হাইকোর্টে মানহানির মামলা করে দিবে।”

মোটাসোটা ভদ্রলোক খুশি খুশি হয়ে বললেন, “হ্যাঁ, সেইটাই তোর আশ্মুর জন্য উচিত শিক্ষা হবে। দশ কোটি টাকার মানহানি মামলা।”

পেছন থেকে বাসার কাজকর্মে সাহায্য করার একজন মহিলা চিকন গলায় বলল, “খালুজান, মামলায় টাকাটা কিন্তুক আপনারেই দিতে হবে।”

ডাইনিং রুমের সবাই হা হা করে হেসে উঠল। একজন বলল, “সত্যি কথা। একেবারে সত্যি কথা।”

মিসেস রওশান ধমক দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিলেন, বললেন, “অনেক হয়েছে। তং বন্ধ করো। তোমরা ভেবেছো কী? চোর ধরা পড়লে আমি কি ছেড়ে দিব? ছাড়ব না। যাই হোক, আমরা কাজ শুরু করি।”

মিসেস রওশান ছোটোচ্চুকে দেখিয়ে বললেন, “ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ডিটেকটিভ শাহরিয়ার হাসান। সাথে তার টিম মেম্বার ফারিহা। তাদেরকে আমি অনেক কষ্ট করে আমার এই কেসটা নিতে রাজি করিয়েছি।”

বিশ-পঁচিশ বছরের একটা ছেলে বলল, “আমি ডিটেকটিভ শাহরিয়ার হাসানের ওপর টেলিভিশনে একটা নিউজ দেখেছিলাম। অসাধারণ ডিটেকটিভ।”

মিসেস রওশানের মেয়ে বলল, “আমি জানতামই না আসলেই ডিটেকটিভ আছে। আমি ভেবেছিলাম খালি গল্প বইয়ে থাকে। “

শওকত সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, “অসাধারণ, অসাধারণ!” ছোটাচ্চু বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, “আসলে আমার নিজের কোনো ক্রেডিট নাই। আমার একটা খুব ভালো টিম ছিল। তাছাড়া এখন নানা ধরনের টেকনোলজি বের হয়েছে, আমাদের বিশেষ কিছু করতে হয় না। টেকনোলজি ব্যবহার করে সবকিছু করে ফেলা যায়।”

ছোটাচ্চু কথা শেষ করে তার হাতে টিস্যু দিয়ে ধরে রাখা একটা চাবি দেখিয়ে বললেন, “এই যে এটা হচ্ছে আলমারির চাবি। এইটা ব্যবহার করে আলমারি খোলা হয়েছিল। কাজেই যে চুরি করেছে তার সিগনেচার এখানে আছে। জিনেটিক সিগনেচার। আমি একটু আগে একটা বিশেষ কেমিক্যাল দিয়ে এটা লেপে দিয়েছি। অপরাধীর জিনেটিক কোডিং এখন এই চাবিতে সিল হয়ে গেছে।”

সবাই মুখ গম্ভীর করে ছোটাচ্চুর কথা শুনতে থাকে। ছোটাচ্চু কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে বলল, “এখন আপনারা একজন একজন করে পাশের ঘরে যাবেন। সেখানে টেবিলের উপর চাবিটা রাখা থাকবে। আপনার চাবিটা মুঠো করে ধরে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনবেন। তারপর চাবিটা রেখে দিবেন। আপনার জিনেটিক কোডিং যদি চাবিতে থাকা জিনেটিক কোডিংয়ের সাথে মিলে যায় তাহলে একটা রেজনেটিং এফেক্ট হবে।”

একজন জিজ্ঞেস করল, “রেজনেটিং এফেক্ট মানে কী?”

“এটা একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়। দুইটা জিনোমের ভিতর মিল থাকলে একটা আরেকটাকে এমপ্লিফাই করে অনেক বড় করে একটা সিগন্যাল দেয়। খালি চোখে আমরা দেখতে পাব না। কিন্তু যদি জিনো ক্রিজিং মিটারে দেওয়া হয় সেই মেশিনটা বলে দেবে।

মিসেস রওশানের মেয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী মেশিন?”

“জিনো ক্রিজিং মিটার। আমাদের দেশে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে নতুন একটা এনেছে। সেখানে আমার এক বন্ধু কাজ করে, সে চেক করে দিতে রাজি হয়েছে। প্রতি স্যাম্পলে একশো ডলারের মতো খরচ হয়, সে কম টাকায় করে দেবে।”

ছোটাচ্চু দেখল মিসেস রওশানের মেয়ে হাতের স্মার্ট ফোনে জিনো ক্রিজিং মিটার খুঁজতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক, কাজেই ছোটাচ্চু তাড়াতাড়ি বলল, “এটা খুবই নতুন টেকনোলজি, এখনও বেশি মানুষ এটা সম্পর্কে জানে না। তবে এটা চেক করার জন্য আলাদা করে সবার জিনেটিক স্যাম্পল দরকার হবে। যেমন সবার একটা করে চুল। কিংবা মুখের স্যালাইভ। কিংবা এক ফোঁটা রক্ত।”

মিসেস রওশানের স্বামী শওকত সাহেব নিজের টাক মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “আমার এমনিতেই চুল নাই, যদি আরও চুল দিয়ে দেই—তাহলে থাকবে কী?”

ছোটাচ্চু হাসল। বলল, “একটা, মাত্র একটা চুল।”

“যার মাথায় চুল নাই তার কাছে প্রত্যেকটা চুল মূল্যবান।”

মিসেস রওশান ধমক দিয়ে বললেন, “অনেক হয়েছে। এখন চুপ করো।” তারপর ছোট্টাচুচুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তাহলে শুরু করে দিই?”

“ঠিক আছে।” ছোট্টাচুচু বলল, “ও আচ্ছা। আরেকটা কথা। এই স্যাম্পল নিতে হয় অন্ধকারে। আলো থাকলে সিগন্যাল নষ্ট করে দেয়। তার কারণ আলো হচ্ছে ফোটন। ফোটন হচ্ছে শক্তির কণা। যখন কণা—”

শওকত সাহেব বললেন, “আমি বিজ্ঞানের কিছু বুঝি না। বিজ্ঞানের কথা শুনলে মাথা ধরে যায়।”

ছোট্টাচুচু বলল, “ঠিক আছে। তাহলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি না। চাবিটা থাকবে একটা ব্যাগের ভিতরে। ব্যাগটা ঢেকে রাখব একটা বড় তোয়ালে দিয়ে যেন আলো ঢুকতে না পারে। আপনারা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে চাবিটা ধরে কিছুক্ষণ মুঠি করে রাখবেন। তারপর চাবিটা ভিতরে রেখে হাত বের করে আনবেন। ঠিক আছে?”

সবাই মাথা নাড়ল, বলল, “ঠিক আছে।”

তখন ছোট্টাচুচু বাইরের ঘরে গিয়ে টেবিলের উপর একটা ব্যাগ রেখে একটা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিল। সবার প্রথমে এল বাসায় কাজকর্মে সাহায্য করার মেয়েটি। তাকে এখন চা বানাতে হবে কাজেই তার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

ব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সে হাত দিয়ে চাবিটা খুঁজতে থাকে। চাবিটা না পেয়ে বলল, “কই? ভেতরে তো চাবি নাই।”

ছোট্টাচুচু বলল, “ও আচ্ছা। সরি। চাবিটা ভিতরে রাখতে ভুলে গেছি। আপনি হাতটা বের করেন, আমি চাবিটা রেখে দিই।”

কাজকর্মে সাহায্য করার মেয়েটি হাত বের করে আনল, ছোট্টাচ্চু একটা টিস্যু দিয়ে ধরে ভেতরে চাবিটা রাখল। মেয়েটি চাবিটা ধরে দশ পর্যন্ত গুনে তার হাত বের করে আনল।

ছোট্টাচ্চু বলল, “চমৎকার! আপনার কাজ শেষ। আপনি এখন যেতে পারেন।”

ফারিহা তখন মেয়েটির মাথা থেকে একটু চুল নিয়ে একটা কাগজে স্কচ টেপ দিয়ে লাগিয়ে পাশে তার নামটা লিখে রাখল। এরপর এলো মিসেস রওশানের মেয়ে। সেও ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে চাবিটা খুঁজে পেল না। খানিকক্ষণ হাত দিয়ে খোঁজাখুঁজি করে বলল, “কোথায়? চাবিটা তো খুঁজে পাচ্ছি না।”

ঠিক আগের বারের মতো ছোট্টাচ্চু বলল, “তাই নাকি? চাবি নাই?”

“নাহ!”

“ও আচ্ছা, রাখতে ভুলে গেছি। হাতটা বের করো, আমি চাবিটা রাখছি ভিতরে।”

মেয়েটা হাত বের করল, ছোট্টাচ্চু টিস্যু দিয়ে ধরে চাবিটা ব্যাগে ভেতরে রাখল। এর পরে এলো পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একজন ছেলে। সেও ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে বলল, “কই? চাবি তো নেই ভেতরে।”

ছোট্টাচ্চু আবার আগের মতো বলল, “ও আচ্ছা! সরি। চাবিটা রাখতে ভুলে গেছি।”

এভাবে চলতে থাকে। ছোট্টাচ্চু ইচ্ছা করে কখনোই ভেতরে চাবিটা রাখে না। আর সবাই চাবিটা খুঁজতে থাকে। যখন খুঁজে পায় না তখন ছোট্টাচ্চু চাবিটা ভেতরে রাখে।

পরপর সাতজন শেষ হওয়ার পর মিসেস রওশানের স্বামী শওকত সাহেব এলেন। তিনি ব্যাগের ভেতরে হাত ঢোকালেন। ভেতরে কোনো চাবি নেই। কিন্তু তিনি কোনো কিছুই বললেন না। খানিকক্ষণ হাত মুঠি করে রেখে হাত বের করে আনলেন। ছোট্টাচ্চু যে ইচ্ছে করে ভেতরে কোনো চাবি রাখছে না সেটা তিনি জানেন না। কাজ শেষ করে যখন উঠে যাচ্ছিলেন ছোট্টাচ্চু তখন তাকে থামাল, নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, “চাবিটা মুঠি করে ধরে রেখে দশ পর্যন্ত গুনেছেন?”

“হ্যাঁ গুনেছি।”

“চমৎকার!”

ছোট্টাচ্চু ফারিহার দিকে তাকাল, ফারিহা ছোট্টাচ্চুর দিকে তাকাল। তারা কি হাসবে নাকি কাঁদবে বুঝতে পারল না। বোঝাই যাচ্ছে মিসেস রওশানের স্বামী মিথ্যা কথা বলছেন, ব্যাগের ভেতর চাবি নাই, চাবিটা ধরে রাখলেন কীভাবে? শওকত সাহেব চলে গেলে পরের জন চলে এসেছিল, ছোট্টাচ্চু তাকে একটু পরে আসতে বলে মিসেস রওশানকে ডেকে পাঠাল।

মিসেস রওশান এসে জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার?”

ছোট্টাচ্চু মাথা চুলকাল, বলল, “আমরা আপনার কেসটা ফিরিয়ে দিচ্ছি। এই কেসে কাজ করাটা ঠিক হবে না।

মিসেস রওশান ভুরু কুঁচকে বললেন, “কাজ করা ঠিক হবে না?”

“না।”

“কেন?”

ছোটাচ্চু ফারিহার দিকে তাকাল, ফারিহাও ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল। কেউ কোনো কথা বলল না। মিসেস রওশান আবার জিজ্ঞেস করল, “কেন? কাজ করা ঠিক হবে না কেন? বের করতে পারবেন না? “

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, “না। বের করতে পেরেছি কিন্তু আপনাকে বলতে পারব না।”

মিসেস রওশান চোখ বড় বড় করে বললেন, “বের করেছেন?”

ছোটাচ্চু চুপ করে রইল। মিসেস রওশান অবশ্যি চুপ করে থাকার মানুষ নয়, আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন, “বলেন, কে? কে আমার গয়না চুরি করেছে?”

ছোটাচ্চু তবু চুপ করে রইল। তখন হঠাৎ করে মিসেস রওশান কিছু একটা আন্দাজ করতে পারলেন। ভুরু কুঁচকে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “শওকত? নিশ্চয়ই শওকত। তাই না?”

ছোটাচ্চু চুপ করে রইল, অনেক কষ্ট করেও মুখের হাসিটা ঢেকে রাখতে পারল না।

মিসেস রওশান গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, “শওকত! শওকত কোথায়? কত বড় সাহস? আমার আলমারি খুলে আমার গয়নার সেট নিয়ে যাও—”

মিসেস রওশানের চিৎকার শুনে শওকত সাহেব এবং অন্য সবাই বসার ঘরে এসে ঢুকল। এত বড় একটা অপকর্ম করে হাতেনাতে

ধরা পড়ার পরেও শওকত সাহেবের মুখে অপরাধের কোনো চিহ্ন নেই। বরং তার চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। ছোট্টাচ্চুর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়াংম্যান। কীভাবে বের করলে? ইউ আর এ জিনিয়াস। তুমি করে বললাম, কিছু মনে করলে না তো?”

ছোট্টাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, “না, না। আপনি তুমি করে বলতে পারেন। কিন্তু—”

“তুমি বের করলে কেমন করে? তোমার যন্ত্রপাতি তো এখানে নেই। “যন্ত্রপাতির ব্যাপারটা আসলে বানানো। ওসব কিছুই না। ব্যাগের ভিতরে কোনো চাবি রাখিনি, কিন্তু আপনি বললেন চাবিটা হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে রেখেছেন। তাই বুঝলাম-”

শওকত সাহেব আনন্দে হা হা করে হাসলেন। বললেন, “হাউ ক্লেভার!”

মিসেস রওশান রাগে তিড়িতিড়ি করে জ্বলতে জ্বলতে বললেন, “হাউ ক্লেভার! তোমার লজ্জা করে না? বউয়ের গয়না চুরি করো—

শওকত সাহেবকে খুব লজ্জা পেতে দেখা গেল না। হাসি হাসি মুখে বললেন, “বাবা, তোমাকে এই গয়না কিনে দিয়েছে কে? খামাখা আলমারির ভিতর পড়ে থেকে ফাংগাস পড়ে যাচ্ছে।”

মিসেস রওশানের মেয়ে বলল, “আব্বু গয়না পাউরুটি না। গয়নায় ফাংগাস পড়ে না।”

মিসেস রওশানের রাগ কমানোর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। হুঙ্কার দিয়ে বললেন; “তুমি পুরুষ মানুষ তোমার গয়নার দরকার পড়ল কেন? কী করেছে আমার গয়না?”

“দিয়ে দিয়েছি।”

“কাকে দিয়েছে?”

“ঐ যে আগুনে পুড়ে একটা ফ্যামিলির সবাই মরে গেল। শুধু একটা মেয়ে বেঁচে গেছে। তার বিয়ে—’

মিসেস রওশানের রাগ একটু কমে এলো। বললেন, “তাকে গয়না দিতে চাও সেটা আমাকে বললে না কেন? আমি কি না করতাম?”

“ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তোমাকে ডিস্টার্ব করতে চাই নাই।” মিসেস রওশান নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, “এর পরের বার থেকে আমাকে বলে-কয়ে দেখবে।

শওকত সাহেব মাথা নাড়লেন, বললেন, “ঠিক আছে।”

তাদের মেয়ে না-সূচক মাথা নাড়ল, বলল, “না আম্মু। আব্বু আসলে গয়না দুই চোখে দেখতে পারে না। পেলেই সেগুলো এদিক-সেদিক দিয়ে দেয়। আম্মু, তুমি যদি তোমার গয়না বাঁচাতে চাও তাহলে ব্যাংকের সেফ ডিপোজিট বক্সে নিয়ে রাখো।”

মিসেস রওশান মাথা নাড়লেন, বললেন, “হ্যাঁ, এখন থেকে সেইটাই করতে হবে।”

শওকত সাহেব লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, “খামাখা গয়না বাঁচিয়ে কী লাভ? কোনো একদিন এলো কোনো চোর, এসে চুরি করে নিয়ে যাবে! এর থেকে একটা কাজে লাগুক—’

মিসেস রওশান বললেন, “থাক। আর লেকচার দিতে হবে না। “ উত্তেজনা আস্তে আস্তে কমে এসেছে। তখন ছোট্টাচ্চু বলল, “আমরা তাহলে এখন যাই?”

মিসেস রওশান বললেন, “একটু চা খেয়ে যান।”

“না, না, চা খেতে হবে না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আপনাদের সাথে পরিচয় হলো, আরেক দিন এসে চা খেয়ে যাব।”

বিদায় নিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় মিসেস রওশান ছোটাচ্চুকে একটা খাম ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ছোটাচ্চু অবশ্য কিছুতেই খামটা নিতে রাজি হলো না। শওকত সাহেব তখন ছোটাচ্চুর টেলিফোন নম্বরটা রেখে দিলেন, তার কোম্পানির কাজে নাকি সাহায্য করার জন্য ছোটাচ্চুকে ডাকবেন।

গাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার পর ফারিহা বলল, “খামটা অনেক মোটা ছিল।”

“হ্যাঁ, অনেক মোটা। নোটগুলো কি পাঁচশো টাকার ছিল, নাকি হাজার টাকার?”

“মনে হলো সব হাজার টাকার নোট।”

ছোটাচ্চু জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, “ইশ! এতগুলো টাকা।”

“হ্যাঁ, এতগুলো টাকা!

ছোটাচ্চু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, “আমার জিনো ক্রিজিং মিটারের গল্লটা কেমন হয়েছিল?”

“ভালো, অনেক ভালো। চাপাবাজিতে তুমি অনেক এক্সপার্ট। এখন নূতন একটা এজেন্সি খুলো, দ্যা আল্টিমেট চাপাবাজি এজেন্সি!”

ছোট্টাচ্চু তার সবগুলো দাঁত বের করে হাসল।

২. খাওয়া-খাওয়ি

ভোরবেলা দরজায় টুংটাং শব্দ শুনে টুনি দরজা খুলে দেখল দরজার সামনে একটা ছেলের হাত ধরে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। কয়দিন থেকে টুনি একটা নতুন জিনিস শুরু করেছে, কোনো মানুষ দেখলেই সেই মানুষটা কী রকম হতে পারে সেটা কল্পনা করা শুরু করে। বেশিরভাগ সময়ই তার কল্পনার সাথে মিলে না, যাকে ভালো মনে করে সে পাজি বের হয়ে যায়, যাকে রাগী মনে হয় দেখা যায় সে হাসি-খুশি, তারপরও টুনি হাল ছাড়ে নাই।

এবারেও দরজার সামনে দাঁড়ানো মহিলা আর ছেলেটাকে দেখে টুনি কল্পনা করতে শুরু করে দিল, মহিলার বয়স তেত্রিশ, ছেলেটির বয়স আট বছর তিন মাস। মহিলার নাম নাজিলা নাশওয়ান। ছেলেটার নাম সিমদান। চেহারা দেখে নাম মেলানো খুব কঠিন— শুধু কঠিন নয় প্রায় অসম্ভব। তবুও টুনি চেষ্টা করে যায়। মহিলা ব্যাংকে চাকরি করে, অস্থির টাইপের। অল্পতেই বিচলিত হয়ে যায়। ছেলেটাকে আদর দিয়ে একটুখানি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। দিন-রাত ইউটিউবে কার্টুন দেখে টুনি মহিলাটা এবং তার ছেলে সম্পর্কে আরও কিছু কল্পনা করতে পারত কিন্তু তার আগেই মহিলা বলল, “এটা জোবেদা খানমের বাসা না?”

টুনির এক মুহূর্ত লাগল মনে করতে যে জোবেদা খানম আসলে তাদের দাদি (কিংবা নানির) নাম। বহুদিন এই বাসায় কেউ তাকে এই নামে ডাকে না।

টুনি বলল, “জি এটা জোবেদা খানমের বাসা।”

মহিলাটা বলল, “জোবেদা খালা বাসায় আছেন?”

টুনি বলল, “আছেন। আপনি বসেন, আমি দাদিকে ডেকে দিই।”

“আমার নাম স্বর্ণা। বল শ্যাওড়া পাড়া থেকে স্বর্ণা এসেছে।”

নামটা মিলল না। টুনি অবশ্য এতে বেশি হতাশ হলো না—নাম—মিলিয়ে ফেলা এত সহজ না। অন্যগুলো মিলে কি না দেখা যাক।

টুনি ভেতরে গিয়ে দাদিকে খবর দিল। দাদি তার ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলেন, মুখ তুলে বললেন, “স্বর্ণা এসেছে?”

টুনি মাথা নাড়ল।

“একা, নাকি সাথে আর কেউ আছে?”

“একটা ছোট ছেলে আছে।”

“যা, তাহলে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।”

যারা একটু ঘনিষ্ঠ দাদি তাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে আসে। অবশ্য দাদির সাথে ঘনিষ্ঠ না এরকম মানুষ খুব কম।

স্বর্ণাকে দেখে দাদি হাসি হাসি মুখে বললেন, “আরে স্বর্ণা! কতদিন পরে তোমাকে দেখছি। এই বুঝি তোমার ছেলে? ওরে বাবা! কত বড় হয়ে গেছে! বয়স কত হলো?”

“সাত।”

টুনি মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ছেলের বয়সটাও মিলল না। সে ভেবেছিল আট বছর তিন মাস।

দাদি হাত বাড়িয়ে বললেন, “এসো দাদা এসো, কাছে এসো। কী যেন নাম তোমার?”

ছেলেটা মুখ শক্ত করে বলল, “সুমন।” কিন্তু দাদির কাছে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করল না। নামটাও মিলল না।

“স্বর্ণা দাদির বিছানার পাশে বসতে বসতে বলল, “খালা, আপনি কেমন আছেন?”

দাদি বললেন, “আমি তো ভালোই আছি। যত বয়স হচ্ছে শরীর তত ভালো হয়ে যাচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি না!”

“বাহ্! কী চমৎকার। আজকাল তো উল্টো ব্যাপার। যাকেই জিজ্ঞেস করি তারই হয় ব্লাড প্রেসার না-হয় ডায়াবেটিস।”

দাদি হাসলেন, বললেন, “এই জন্য কখনো ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না। ডাক্তারের কাছে গেলেই ডাক্তার কিছু একটা রোগবালাই বের করে ফেলবে।

স্বর্ণাকে একটুখানি অবাক এবং অনেকখানি দুশ্চিন্তিত দেখা গেল, বলল, “আপনি ডাক্তারের কাছে যান না? মাঝে মাঝে চেকআপ করান না?”

“মাথা খারাপ! রোগবালাই নাই, খামাখা ডাক্তারের কাছে কেন যাব? আগে কিছু একটা হোক তারপর যদি যেতেই হয় তাহলে যাব।”

স্বর্ণা মাথা নাড়ল, বলল, “না খালা। মাঝে মাঝে চেকআপ করাতে হয়। আমি চেকআপ করিয়েছিলাম বলেই তো আমার

কোলেস্টেরল ধরা পড়ল। এখন গরুর গোশত, ডিমের কুসুম বন্ধ। দুই বেলা ওষুধ।”

দাদি হাসি হাসি মুখে বললেন, “এই জন্যই তো ডাক্তারের কাছে যেতে চাই না, প্রথমেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিবো।” দাদি আবার ছেলেটার দিকে তাকালেন, বললেন, “মাশাআল্লাহ্ তোমার ছেলেটা কত ফুটফুটে হয়েছে –“

“ফুটফুটে?” স্বর্ণা প্রায় আর্তনাদ করে বলল, “কী বলছেন আপনি? শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে।”

টুনি ভালো করে তাকাল, একটু শুকনো সত্যি কিন্তু মোটেই ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার মতো শুকনা না। আজকাল সবার ঘরে থলথলে মোটা মোটা বাচ্চা, সেই তুলনায় এই বাচ্চাটা যথেষ্ট ভালো।

স্বর্ণার মনে হলো কথা বলার জন্য তার প্রিয় একটা বিষয় পেয়ে গেল, চোখ কপালে তুলে হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে শুরু করল, “খালা, আপনি চিন্তা করতে পারবেন না এই ছেলে নিয়ে কী সমস্যা।”

দাদিকে সমস্যা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তিত মনে হলো না। হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, “কী সমস্যা?”

“খেতে চায় না। একবারে কিচ্ছু খেতে চায় না।”

“এটা খালি তোমার সমস্যা না। এটা সবার সমস্যা। এই বাসার ছেলেমেয়েরাও কি খেতে চায় ভেবেছে?”

টুনির মনে হলো এই বাড়ির মেয়ে হিসেবে তার একটু প্রতিবাদ করা দরকার। সে মাথা তুলে বলল, “নানি, আমরা খেতে চাই না এটা ঠিক না। শান্ত ভাইয়া একাই আমাদের দশজনের সমান খেয়ে ফেলে।”

“সেগুলি সব অখাদ্য-কুখাদ্য। ভালো জিনিস তোরা মুখে তুলতে চাস না।”

“দাদি, তুমি যদি মনে করো পৃথিবীতে ভালো খাদ্য মানে করলা ভর্তা, টেঁড়স ভাজি আর কচুর লতি তাহলে সেগুলি কে খেতে চাইবে?”

স্বর্ণা বলল, “না খালা, আমি মোটেও শাকসবজির কথা বলছি না। এই সুমন কোনো খাবার মুখে তোলে না। ফ্লায়েড চিকেন দেন, পিৎজা দেন, হ্যামবার্গার দেন, নুডলস দেন, আইসক্রিম দেন, কেক দেন, কিচ্ছু খাবে না। খাবার যেন তার কাছে বিষ!”

টুনি এবারে ভালো করে ছেলেটার দিকে তাকাল। তার মা যখন তার সম্পর্কে বলছে তখন মনে হলো সে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে। সে যে কিচ্ছু খায় না সেটা তার কাছে অনেক বড় একটা অহঙ্কারের ব্যাপার।

স্বর্ণা বলতে থাকল, “সকাল থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আমি খাবারের থালা নিয়ে সুমনের পিছনে পিছনে ছুটতে থাকি, সেও মুখ বন্ধ করে ছুটতে থাকে। অনেক সাধ্য-সাধনা করে যদি এক চামচ খাওয়াতে পারি তাহলে সেটা আমার সাত পুরুষের ভাগ্য।”

টুনি তাকিয়ে দেখল, সুমন তার মায়ের কথাটাকে নিজের প্রশংসা হিসেবে নিয়েছে। তার মুখে এখন রীতিমতো গৌরবের চিহ্ন। হাসি হাসি মুখ।

স্বর্ণা মাথায় থাবা দিয়ে বলল, “কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি না। সবাই ভাবে আমার ছেলেকে আমি খেতে দেই না! অথচ আমি দিন-রাত চক্ৰিশ ঘণ্টা আমার ছেলের পিছনে লেগে থাকি। খাবার নিয়ে পিছনে পিছনে ঘুরি, ছেলে খাবার মুখে তুলে না। শেষ পর্যন্ত কি করি জানেন?”

দাদি জিজ্ঞেস করলেন, “কী করো?”

“ভাত, ডাল, মাছ, মাংস ব্লেন্ডারে পিষে ফেলি। পুরোপুরি লিকুইড। তারপরে গ্লাসে করে মুখ হাঁ করিয়ে গলায় ঢেলে দেই।”

“তখন খায়?”

“মাথা খারাপ হয়েছে আপনার? নিজে নিজে খাবে? কক্ষনো না। জোর করে খাওয়াতে হয়। হাসপাতালে যেভাবে জোর করে খাওয়ানো হয় অনেকটা সেই অবস্থা।”

দাদি অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকালেন। ছেলেটা বেশ অহঙ্কারের একটা হাসি দিল। টুনিও ভালো করে ছেলেটাকে লক্ষ করল, এক-দুই বছরের ছোট বাচ্চাদের বেলায় এরকম গল্প শুনেছে। কিন্তু সাত বছরের বড় একটা ছেলের বেলায় যে এরকম হতে পারে সে কখনো কল্পনা করেনি। সে মনে মনে যেটা ভাবছিল, দাদি তখন সেটাই স্বর্ণাকে বললেন।

দাদি বললেন, “স্বর্ণা, আসলে তুমি মনে হয় বিষয়টাকে বেশি সিরিয়াসলি নিয়েছো। যে বাসায় খাওয়া-দাওয়া আছে সেই বাসায় কখনো কোনো বাচ্চা না খেয়ে মারা যায় নাই। তোমার উচিত জোর না করা। তাহলেই সে নিজে নিজে খাওয়া শিখবে।”

স্বর্ণা মাথা নাড়ল, “কোনোদিন শিখবে না। নিজে নিজে খেতে দিলে খাবেই না।” স্বর্ণা তার ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, “তাই না সুমন? খাবি?”

সুমন সগৌরবে মাথা নাড়ল, বলল, “নাহ্। খাব না। আমার খেতে ভালো লাগে না।”

স্বর্ণা বলল, “শুনেছেন? শুনেছেন খালা– কী বলল?”

দাদি মাথা নাড়লেন, বললেন “শুনেছি।”

টুনির যথেষ্ট শোনা হয়েছে। স্বর্ণা আর তার ছেলের নাম আর বয়স নিয়ে যেটা কল্পনা করেছিল সেগুলো মেলেনি কিন্তু অন্য সবকিছু মিলে গেছে। ছেলেটা হালকাভাবে বখে যাওয়া। মা অস্থির টাইপের, অল্পতেই বিচলিত।

টুনি যখন ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন দাদি বললেন, “টুনি। এই বাচ্চাটাকে সাথে নিয়ে যা। তার সাথে একটু খেলাধুলা কর।”

বখে যাওয়া বাচ্চাদের নিয়ে খেলাধুলা করা খুব সহজ না। কিন্তু সেটা তো আর মুখ ফুটে বলা যায় না, তাই সে কিছু বলল না। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, “এসো সুমন, আমরা খেলি।”

“কী খেলবে?”

“তুমি যেটা খেলতে চাও।”

“আমি কিছু খেলতে চাই না।”

“ঠিক আছে। তাহলে সেটাই খেলব। কিছু খেলতে না চাওয়ার খেলা।”

সুমন অবাক হয়ে বলল, “সেটা কেমন করে খেলে?”

“আমার সাথে এসো। তাহলে দেখবে।”

সুমন শেষ পর্যন্ত কৌতূহলী হয়ে টুনির সাথে গেল।

তিন তলায় টুনি টুম্পা, রিমকি আর পিয়ালকে পেয়ে গেল। তারা

একটা কার্ড বোর্ডের বাক্সে মিতুলকে ঢুকিয়ে চিৎকার করে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। টুনিকে অপরিচিত একটা ছেলেকে নিয়ে ঢুকতে দেখে সবাই থেমে গেল। টুম্পা জিজ্ঞেস করল, “এইটা কে টুনি আপু?”

“এর নাম হচ্ছে সুমন। সুমন তোদের সাথে একটা নতুন খেলা খেলতে এসেছে।

বাচ্চারা নতুন খেলার কথা শুনে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, “কী খেলা? কী খেলা টুনি আপু?”

“খেলাটার নাম হচ্ছে, কিছু খেলতে চাই না। “

“কিছু খেলতে চাই না! এটা আবার কী রকম খেলা?”

“খুবই সোজা। যে এটা খেলতে চায় তাকে এই কার্ড বোর্ডের বাক্সে ঢুকিয়ে সবাই মিলে চিৎকার করবি, খেলতে চাই না, খেলতে চাই না, আমি কিছুই খেলতে চাই না।”

“এইটাই খেলা?”

“এইটা দিয়ে শুরু। তারপর আরও অনেক কিছু হবে।”

“আর কী হবে?”

“সব আমি বলে দিব নাকি? তোরা নিজেরা চিন্তা করে বের কর।

একটু পরেই খেলা শুরু হয়ে গেল। খেলার অনেক রকম ডালপালা বের হলো। কে খেলবে না, কেন খেলবে না, কী খেলবে না, খেললে কী শাস্তি দেওয়া হবে, এইটুকুন পর্যন্ত মোটামুটি শাস্তিপূর্ণভাবে খেলা হলো কিন্তু যখন বিনা কারণে শাস্তি দেওয়া শুরু হয়ে গেল তখন খেলাটি ধীরে ধীরে জঙ্গি রূপ নিতে থাকে। খেলাটা যখন মোটামুটি যথেষ্ট জঙ্গি হয়েছে তখন নিচ থেকে ঝুমু খালা এসে জানাল সুমনকে তার মা ডেকে পাঠিয়েছে। টুনি এবং তার সাথে অন্যরাও নিচে নেমে এলো।

টুনি দেখল স্বর্ণা দাঁড়িয়ে আছে চেহারার মাঝে খানিকটা অস্থির ভাব। সুমনকে দেখেই তার কাছে গিয়ে বলল, “বাবা, আমাকে এখনই মানিকগঞ্জ যেতে হবে।”

সুমন মুখ ভোঁতা করে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, “না, তুমি যাবে না।”

স্বর্ণা অপরাধীর মতো বলল, “আমাকে যেতেই হবে বাবা।”

“না, আমি মানিকগঞ্জ যাব না। মানিকগঞ্জ আমার ভালো লাগে না!”

“ভালো না লাগলেও যেতে হবে বাবা।

“না, আমি যাব না।”

“আমিও তো যেতে চাচ্ছিলাম না। হঠাৎ করে তোর বাবা ফোন করল, ইমার্জেন্সি-’

“না, না, আমি যাব না। “

টুনি রীতিমতো মুগ্ধ চোখে পুরোপুরি বখে যাওয়া ছেলে কেমন হয় সেটা দেখতে লাগল।

হঠাৎ করে দাদি বলে বসলেন, “স্বর্ণা, তুমি তোমার ছেলেকে এখানে রেখে মানিকগঞ্জ চলে যাও। আমাদের বাচ্চা-কাচ্চারা ওকে নিয়ে খেলাবে, ব্যস্ত রাখবে।”

টুনি মনে মনে দোয়া করতে লাগল যেন স্বর্ণা রাজি না হয়, এই বখে যাওয়া ছেলেকে সারাদিন দেখে রাখা কঠিন ব্যাপার হবে।

কিন্তু স্বর্ণা কেমন যেন নিমরাজি হয়ে গেল। বলল, “কিন্তু আপনারা তো ওকে খাওয়াতে পারবেন না।”

“কেন খাওয়াতে পারব না? আমি আমার ছেলে-মেয়েকে খাওয়াই নাই, নাতি-নাতনিকে খাওয়াই নাই?”

স্বর্ণা বলল, “তাহলে তো খুবই ভালো হয়। খাওয়ানোর জন্য একটু জোর করতে হবে। যদি ইউটিউবে একটা ভয়ের সিনেমা দেখানো হয় তখন মুখে খাবার তুলে দিলে খেয়ে নেয়।”

“তুমি চিন্তা কোরো না- নিশ্চিন্ত মনে যাও। ফিরে যাওয়ার সময় তোমার বাচ্চাকে নিয়ে যেয়ো।

“আমার ফিরতে ফিরতে কিন্তু অনেক রাত হবে।”

দাদি বললেন, “কোনো সমস্যা নাই। আমরা আছি।”

টুনি একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এইটা হচ্ছে দাদির সমস্যা। দুনিয়ার সব মানুষের দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকেন!

ঠিক যখন স্বর্ণা তার ছেলেকে টুনিদের হাতে দিয়ে বের হয়ে গেল তখন টুনির মাথায় হঠাৎ করে একটা বুদ্ধি উঁকি দিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ করে সে সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, “সুমন, তোমার খেতে ভালো লাগে না, তাই না?”

সুমন মাথা নাড়ল।

টুনি হাসি হাসি মুখে বলল, “কী আনন্দ! তোমার আর খেতে হবে না।”

“খেতে হবে না?”

“না, যতদিন তুমি এই বাসায় থাকবে তোমার কিছু খেতে হবে না।”

সুমন শুকনো মুখে বলল, “কিছু খেতে হবে না?”

“না, তোমাকে আমরা কোনো খাবার দিব না। কী মজা! তাই না!”

সুমন দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল। কিন্তু তাকে দেখে মনে হলো না ব্যাপারটা তার কাছে খুব মজার ব্যাপার মনে হচ্ছে। সে খেতে চাইবে না, সবাই তাকে সাধ্যসাধনা করে খাওয়ানোর চেষ্টা করবে সে এটাতেই অভ্যস্ত। কিন্তু তাকে খেতেই দেবে না। এটা তো সে একবারও চিন্তা করে নাই।

টুনি চোখ বড় বড় করে বলল, “এতদিন তোমার কত কষ্ট হয়েছে! তোমার আশু তোমাকে জোর করে খাইয়েছে। এখন কোনো জোরাজুরি নাই, কোনো খাওয়া-খাওয়ি নাই। কী মজা, কী আনন্দ!”

সুমনকে ঠিক আনন্দিত দেখা গেল না। ঠিক তখন দেখা গেল ঝুমু খালা একটা ট্রেতে করে কিছু নাশতা নিয়ে এসেছে। টুনিকে জিজ্ঞেস করল, “কী হলো, মেহমান কই?”

টুনি সুমনকে দেখিয়ে বলল, “এই যে ছোটজন। ওর আশ্মু চলে গেছেন। রাত্রে এসে নিয়ে যাবেন।”

ঝুমু খালা খাবার ট্রেটা টেবিলে রেখে বলল, “ঠিক আছে তোমরা খাও। বাচ্চাটারে কিছু খাইতে দাও।”

টুনি আঁতকে ওঠার ভান করে বলল, “না না ঝুমু খালা। সর্বনাশ!”

ঝুমু খালা অবাক হয়ে বলল, “কী সর্বনাশ?”

“সুমন একেবারে খেতে পছন্দ করে না। সুমনকে একেবারে খেতে বোলো না। সে আজকে কিচ্ছু খাবে না।”

“কিচ্ছু খাইব না?”

“না। এখন নাস্তা খাবে না। দুপুরে ভাত খাবে না। বিকালেও নাস্তা করবে না। রাত্রেও কিচ্ছু খাবে না। তাই না সুমন?”

সুমন শুকনো গলায় ঢোঁক গিলল, কোনো কথা বলল না। টুনি বলল, “তুমি তাড়াতাড়ি সব নাস্তা নিয়ে যাও। খাবার দেখলেই সুমনের খুব খারাপ লাগে।”

ঝুমু খালা খাওয়া নিয়ে বিশাল একটা লেকচার দেওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিল কিন্তু টুনির মুখে দুষ্টুমির চাপা হাসি দেখে বুঝে গেল যে এটা একধরনের নাটক, কাজেই ঝুমু খালা সাথে সাথে নাটকে অংশ নিয়ে নিল। বলল, “সেই কথাটা আগে বলবা তো! ঠিক

আছে, আমি নাস্তাগুলো নিয়ে যাই। এর সারাদিন সারারাত কিছু খেতে হবে না।”

টুনি ট্রের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, “নিয়ে যাওয়ার দরকার নাই, এইখানে রেখে যাও ঝুমু খালা। আমি একটু খাই, অন্যদেরকেও বলো। এই খাবারগুলি খুবই টেস্টি মনে হচ্ছে!” তারপর জিভে লোল টানার মতো শব্দ করল, “উ ম-ম-ম!”

ঝুমু খালা টেবিলে খাবার ট্রেটা রেখে ভিতরে অন্যদের ডাকতে গেল। টুনি একটা ডালপুরি নিয়ে তার স্রাণ শুঁকে চোখ বন্ধ করে এক কামড় খেয়ে মুখে ইয়াম ইয়াম জাতীয় একটা শব্দ করতে লাগল। ডালপুরিটা এমনভাবে চাবাতে লাগল যে দেখে মনে হতে লাগল এর চাইতে সুস্বাদু খাবার পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। টুনি ডালপুরিটা আরেক কামড় খেয়ে আবার আনন্দের একটা শব্দ করে চোখ বন্ধ করল। চোখের কোনা দিয়ে দেখল সুমন কেমন জানি লোভ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝুমু খালা ভেতরে গিয়ে বাসায় অন্য বাচ্চাদের নিশ্চয়ই এখানকার নাটকটার একটা ইঙ্গিত দিয়েছে কারণ কয়েক মিনিটের ভিতর ভিতর থেকে বাচ্চারা “ডালপুরি ডালপুরি! কেক কেক! আইসক্রিম আইসক্রিম!!” বলে চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকে গেল। তারপর কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগল!

একজন ডালপুরিতে একটা কামড় দিয়ে বলল, “আ হা হা হা—”

একজন কেকে একটা কামড় দিয়ে বলল, “উহ হু হু হু...”

একজন এক চামচ আইসক্রিম মুখে দিয়ে বলল, “উম ম ম ম...”

সুমন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল, খাবার যে এভাবে খাওয়া যায় সে কোনোদিন এটা আগে দেখে নাই। সে ধরেই নিয়েছিল এটা জোর করে খাওয়ানোর একটা বিষয়।

নাস্তা শেষ করে সবাই চলে যাওয়ার পর সুমনকে নিয়ে বাচ্চারা আবার খেলতে গেল। কানামাছি এবং লুকোচুরি মিলিয়ে একটা বিপজ্জনক খেলা আবিষ্কার করা হয়েছে, সেটা খেলতে খেলতে দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেল। ঝুমু খালা টেবিলে খাবার দিয়েছে এবং বাচ্চারা কেউ কেউ টেবিল ঘিরে, কেউ কেউ এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খেতে বসেছে। সুমন ঠিক কী করবে বুঝতে না পেরে ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঝুমু খালা সবাইকে প্লেট দিয়ে সুমনকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি একটা থালা নিবা?”

সুমন কিছু বলার আগেই টুনি বলল, “না না ঝুমু খালা, সুমনকে প্লেট দিও না। সুমন খাবে না।”

ঝুমু খালা জিজ্ঞেস করল, “তুমি কেমন করে জানো হে খাইব না?”

“আমি জানি। ওর আন্মু বলেছেন, সুমন খেতে পছন্দ করে না। তাই না সুমন?”

সুমন কোনো উত্তর দিল না। টুম্পা ভুরু কুঁচকে বলল, “না খেলে খিদে লাগবে না?”

টুনি বলল, “উঁহু। সুমনের খিদে লাগে না। তাই না সুমন?”

সুমন এবারেও কোনো উত্তর দিল না।

ঝুমু খালা মুখে ংকটা গাস্তীর্ঘের ভান করে বলল, “আমি বলি কী, সুমনকে ংকটা প্লেটে ংকটু খাবার দেই। সে খাবারটা নিয়ে বসে থাকুক। ইচ্ছে না হলে খেতে হবে না।”

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, “কিন্তু সুমন তো নিজে নিজে খেতে পারে না। সবসময় তার আন্মু খাইয়ে দেয়। তাই না সুমন?”

ঝুমু খালা বলল, “আজকে চেষ্টা করে দেখা যাক, নিজে নিজে পারে কি না।”

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, “পারে না। পারবে না।”

কয়েকজন বলল, “পারবে। পারবে।”

অন্যরা বলল, “না, পারবে না। পারবে না।”

তখন “পারবে” ংবং “পারবে না” ংই দুই দলে ংগড়া লেগে গেল।

ংই প্রচণ্ড ংগড়ার মাঝখানে ংমু খালা সুমনের হাতে ংকটা প্লেটে ভাত, মুরগির মাংস আর সবজি তুলে দিল। কেউ সরাসরি তাকাল না কিন্তু সবাই চোখের কোনা দিয়ে দেখল সে গপগপ করে খেতে শুরু করেছে।

স্বর্ণার ফিরে আসতে বেশ রাত হলো। স্বর্ণা যখন তার ছেলেকে নিতে ংসেছে সে ংবাক হয়ে দেখল তার ছেলে রীতিমতো ভদ্র মানুষের মতো ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছে। স্বর্ণা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কিছু ংকটা বলতে যাচ্ছিল, দাদি চোখের ইশারায় তাকে নিষেধ করলেন।

মাকে দেখে সুমন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, “আম্মু তুমি কখন আসবে তো জানি না। তাই নিজে নিজে খেয়ে নিচ্ছি।”

স্বর্ণা চৌক গিলে বলল, “খেয়ে নিচ্ছিস? নিজে নিজে?” সুমন বলল, “হ্যাঁ আম্মু।”

“গুড। গুড। ভেরি গুড। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?”

“অসুবিধা? না আম্মু অসুবিধা কেন হবে?” সুমন আরও একটু বোল নেওয়ার জন্য তার প্লেটটা বুমু খালার দিকে এগিয়ে দিল।

৩. কালা জাহাঙ্গীর এবং স্মার্ট ফোন

ফারিহা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়িটার গতি কমাল, তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, বাম পাশে দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস। কেন সে এই অফিসটার সামনে ব্রেক কষল সে জানে না, আবার এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাবে নাকি গাড়িটা পুরোপুরি থামাবে ফারিহা ঠিক বুঝতে পারল না। কী ভেবে শেষ পর্যন্ত ফারিহা গাড়িটা রাস্তার পাশে এনে পুরোপুরি থামাল। চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিনটা বন্ধ করার সাথে সাথে সাত-আট বছরের একটা ছেলে হাতে বেশ কয়েকটা বেলুন নিয়ে গাড়ির জানালায় মুখ লাগিয়ে বলল, “আপা, দুইটা বেলুন কিনেন না!”

ফারিহা বলল, “আমি বেলুন দিয়ে কী করব?”

“খেলবেন।”

ফারিহা হেসে ফেলল এবং সাথে সাথে বুঝে গেল হাসাটা ঠিক হয় নাই। এখন তাকে বেলুন কিনতেই হবে। মুখ গম্ভীর করে কোনো

কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ালে বেলুন না কিনে উদ্ধার পাওয়ার সুযোগ ছিল। ফারিহাকে হাসতে দেখে ছেলেটা উৎসাহ পেলে, বলল, “আপনি খেলতে না চাইলে বাচ্চারে খেলতে দিবেন।”

“আমার বাসায় কোনো বাচ্চা নাই। “

“তাহলে বেলুনগুলো কিনে বাসায় নিয়ে ফাটাবেন। বেলুন ফাটাতে অনেক মজা। অনেক শব্দ হয়।

ফারিহা এবারে ছেলেটাকে ভালো করে দেখল, পকেটের পয়সা দিয়ে বেলুন কিনে সেটা ফাটানোর বুদ্ধি এর আগে তাকে কেউ দেয় নাই। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নাই এটা বেলুনের একটা ব্যবহার হতেই পারে।

ছেলেটা হাসি হাসি মুখে বলল, “আমার যখন অনেক টাকা-পয়সা হবে তখন আমি অনেকগুলো বেলুন কিনে ঠাস ঠাস করে সবগুলো ফাটামু।”

ফারিহা কিছুক্ষণ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর জিজ্ঞেস করল, “তোমার নাম কী?”

“জুয়েল।”

“তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে? নাকি তুমি বোকা টাইপ?”

জুয়েল নামের ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড ফারিহার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, “বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে।”

“কেমন করে জানো?”

“আপনে পরীক্ষা করে দেখেন।”

“ঠিক আছে আমি পরীক্ষা করে দেখি। যদি পরীক্ষায় পাস করো তাহলে তোমার সবগুলো বেলুন আমি কিনে নিব। “

“খোদার কসম?”

“কসম কাটার দরকার নাই। আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করলেই হবে।”

“ঠিক আছে। আমার বুদ্ধির পরীক্ষা নেন।”

“তোমাকে একটা কাজ করতে দিব। তুমি যদি কাজটা ঠিক করে করতে পারো তাহলে বুঝব তুমি বুদ্ধির পরীক্ষায় পাস করেছো।”

“বলেন আপা, কী করতে হবে বলেন।” ছেলেটা উৎসাহী হয়ে উঠল।

ফারিহা দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিসটা দেখিয়ে বলল, “ঐ যে অফিসটা দেখো, তুমি তোমার বেলুনগুলো নিয়ে এই অফিসে ঢুকবে। দেখবে ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়া একটা মহিলা বসে আছে। তাকে একটা বেলুন দিয়ে বলবে— আপা, এইটা আপনার গিফট।”

“জে, বলবা।”

“দেখবে তার সামনে কেউ বসে তার সাথে কথা বলছে কি না। যদি কোনো মানুষ থাকে তাকেও একটা বেলুন গিফট দেবে। দিয়ে বলবে, স্যার, আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি। খুবই জরুরি কথা। তারপরে তাকে জরুরি কথাগুলো বলবে। যদি ঠিকভাবে কথাগুলো বলে আসতে পার আমি তোমার সবগুলো বেলুন কিনে নিব।”

“কী কথা বলতে হবে? মা-বাবা তুলে গালি?”

“না না না” ফারিহা আঁতকে উঠে বলল, “কোনো গালাগাল না, খুবই ভদ্রভাবে কথা বলবে। পারবে না?”

“কী বলতে হবে বলেন।”

ফারিহা তখন কী বলতে হবে সেটা শিখিয়ে দিল। একবার ছেলেটাকে দিয়ে প্র্যাকটিস করাল। তারপর তাকে মিশনে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে তার গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

জুয়েল যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে অফিসের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দেয়। সত্যি সত্যি কড়া লিপস্টিক লাগানো একজন মহিলা বসে আছে এবং একজন বয়স্ক মানুষ তার সামনে বসে কথা বলছে। জুয়েল দরজার দাঁড়িয়ে বলল, “আসতে পারি ম্যাডাম?”

রিসেপশনিস্ট মহিলাটা বিরক্ত হয়ে বলল, “না-না-, আমি কোনো বেলুন কিনব না।”

“বেলুন কিনতে হবে না ম্যাডাম, আমি একটা কাজে এসেছি।”

“কী কাজ?”

“ভিতরে এসে বলি?”

“ঠিক আছে, আসো।”

জুয়েল ভিতরে ঢুকে একটা বেলুন আলাদা করে রিসেপশনিস্ট মহিলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “নেন ম্যাডাম। আপনার জন্য গিফট।”

রিসেপশনিস্ট মহিলা অবাক হয়ে বলল, “গিফট? আমার জন্য?”

“সবার জন্য ম্যাডাম।” বলে আরেকটা বেলুন আলাদা করে বয়স্ক মানুষটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “এইটা আপনার জন্য।”

বয়স্ক মানুষটা অবাক হয়ে বললেন, “আমার জন্য?”

“জে। আপনার জন্য একটা মেসেজও আছে।”

“মেসেজ আছে? আমার জন্য?”

“জে।” তারপর তোতা পাখির মতো মুখস্থ বলতে শুরু করল, “এই ডিটেকটিভ কোম্পানিটা তৈরি করেছিলেন একজন বিখ্যাত ডিটেকটিভ শাহরিয়ার হাসান। সরফরাজ কাফী নামে একজন ভুয়া মানুষ সেই কোম্পানিটা দখল করে নিয়েছে। এরা আপনার কোনো কাজ করে দিতে পারবে না, শুধু শুধু আপনার টাকা নষ্ট হবে।”

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা তার চেয়ারে লাফ দিয়ে উঠে বলল, “এই ছেলে থামো! থামো! কী বলছে তুমি এইসব!”

জুয়েল একটুও বিচলিত হলো না, ঠান্ডা গলায় বলল, “সত্যি কথা বলেছি ম্যাডাম। আমার কথা বিশ্বাস না করলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।”

“বের হও— বের হও এখান থেকে।

“জি ম্যাডাম। গুড আফটারনুন।” বলে সে এবাউট টার্ন করে রীতিমতো লেফট-রাইট করতে করতে বের হয়ে এলো।

গাড়িতে হেলান দিয়ে থাকা ফারিহা জুয়েলকে বের হতে দেখে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, “কী হলো? পেরেছো বলতে?”

জুয়েল দাঁত বের করে হাসল, বলল, “জি আপা। বলছি। কোনো ভুল হয় নাই।”

“বেয়াদবি করো নাই তো?”

“জে না আপা।”

“গুড। এখন বলো তোমার সবগুলো বেলুন কত?”

জুয়েল হিসাব করে দাম বলল। ফারিহা দাম মিটিয়ে বেলুনগুলো হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে সবগুলো আবার জুয়েলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, “নাও।”

জুয়েল শঙ্কিত সুখে বলল, “আপনি বেলুন নিবেন না?”

“নিলাম তো!”

“তাহলে?”

“তুমি বেলুন ফাটাতে চেয়েছিলে, এগুলো নিয়ে ফাটাও।

জুয়েল চকচকে চোখে বলল, “খোদার কসম?”

“আমি কসম কাটতে পারব না। আমার কথা এমনিতেই বিশ্বাস করতে হবে।”

“ঠিক আছে আপা।” বলে বেলুনগুলো নিয়ে ছুটে যেতে গিয়ে থেমে গেল। ফারিহার দিকে তাকিয়ে বলল, “আপা, যদি আমি

তেলা মেরে এই অফিসের সব জানালা গুঁড়া করে দিই তাহলে আমারে কত দেবেন?”

“কিছু দিব না। সেইটা হবে বদকাজ। তুমি কি বদ?”

জুয়েল কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর মুখ কালো করে বলল, “জি আপা।”

ফারিহা মুখ শক্ত করে বলল, “বদ মানুষের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। বুঝেছো?”

জুয়েল কিছু একটা বলতে চাইছিল। কিন্তু ঠিক তখনই আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির দরজা খুলে একজন বয়স্ক মানুষ এদিক-সেদিক তাকায় এবং হঠাৎ করে বেলুন হাতে জুয়েলকে ফারিহার সাথে দেখে দ্রুত পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জুয়েল কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর তার কী মনে হলো কে জানে, বেলুনগুলো হাতে ধরে আনন্দে একটা চিৎকার করে ছুটে যেতে থাকে।

বয়স্ক মানুষটা ফারিহার কাছে এসে তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, “ম্যাডাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?”

“করেনা।”

“এই ছেলেটাকে আপনি চিনেন?”

“একটু আগে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে।”

“সে যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো সত্যি?”

“সে ভিতরে ঠিক কী বলেছে তো আমি জানি না কিন্তু যেগুলো বলার কথা সেগুলো বলে থাকলে সত্যি কথা বলেছে।”

বয়স্ক মানুষটা মাথা নাড়ল, তারপর বলল, “আমিও তাই ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে এই কোম্পানিটার সমস্যা আছে। এদেরকে কোনো কেস দিলে টাকা নষ্ট হবে।”

“কেন? কী করেছে এরা?”

“আমি একটা কেস নিয়ে গেছি কিন্তু। এরা আমার কোনো কথা শোনার আগে শুধু টাকার কথা বলে। শুধু অ্যাডভান্স পেমেন্টের কথা বলে।”

ফারিহা কোনো কথা বলল না, চুপ করে রইল। বয়স্ক মানুষটা আবার বলল, “আমাকে দিয়ে একটা কাগজ সাইন করিয়ে নিতে চাইছিল।”

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, “কী কাগজ?”

সেই কাগজে লেখা, “যদি তারা কেস সলভ করতে না পারে তাহলে তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নাই। তারা কোনো টাকা ফেরত দিবে না।”

ফারিহা এবারেও কোনো কথা বলল না। বয়স্ক মানুষটা বলল, “আমি যখন জিজ্ঞাস করলাম এই কোম্পানিতে শাহরিয়ার সাহেব নাই কেন, ঠিক করে উত্তর দেয় না। আঁ উঁ করে।

বয়স্ক মানুষটা এবারে আসল কথায় চলে এলো, জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি শাহরিয়ার সাহেবকে চিনেন?”

ফারিহা বলল, “হ্যাঁ, শাহরিয়ার আমার বন্ধু।”

“আমাকে উনার কাছে নিয়ে যাবেন? উনাকে আমার কেসটা দিতে চাই।”

ফারিহা মাথা নাড়ল, বলল, “উঁহু। সেটা সম্ভব হবে না। শাহরিয়ার ডিটেকটিভ কাজ ছেড়ে দিয়েছে।”

“ছেড়ে দিয়েছেন?”

“হ্যাঁ। সরফরাজ কাফী তার কোম্পানিটা দখল করে নেওয়ার পর শাহরিয়ার ডিটেকটিভ কাজ করে না।”

“সে কী!” বয়স্ক মানুষটাকে বিভ্রান্ত দেখাল। বলল, “তাহলে আমরা কার কাছে যাব?”

ফারিহা মাথা নাড়ল, “জানি না। খোঁজ দিয়ে দেখেন। আরও প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিশ্চয়ই আছে।”

“নাই।”

“আপনার কেসটা কী আমি জানি না। পুলিশের কাছে যেতে পারেন।”

বয়স্ক মানুষটা মাথা নাড়ল, বলল, “না, না, না। পুলিশের কাছে যাওয়া যাবে না। এখন কী করি বলেন দেখি!”

ফারিহা টের পেল বয়স্ক মানুষটা তার সমস্যাটাকে এখন ফারিহার সমস্যা হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। সে এই প্যাঁচের মাঝে পড়তে চায় না। তাই উদাস মুখে বলল, “দেখেন চিন্তা করে কী করা যায়।”

“আপনি কি শাহরিয়ার সাহেবের ঠিকানাটা দিতে পারেন? আমি তাহলে গিয়ে একটু দেখা করতাম।”

ফারিহা মাথা নাড়ল, বলল, “উঁহু। সেটা ঠিক হবে না। শাহরিয়ার একেবারে চায় না। আমার ওপর খুবই রাগ হবে। তাছাড়া—”

“তা ছাড়া কী?”

“আপনাকে আমি সরফরাজ কাফী থেকে সরিয়ে এনেছি। এখন যদি শাহরিয়ারের কাছে নিয়ে যাই তাহলে মনে হবে আমি বুঝি শাহরিয়ারের কাছে ক্লায়েন্ট নেওয়ার জন্য সরফরাজ কাফীর অফিসে গেছি। সেটা খুবই খারাপ হবে!”

বুড়ো মানুষটাকে কেমন যেন হতাশ দেখাল। মাথা চুলকে বলল, “তাহলে শাহরিয়ার সাহেবের সাথে দেখা করার কোনো উপায় নাই? আমি খুবই বিপদের মাঝে আছি। বলতে পারেন প্রায় জীবন-মরণ সমস্যা।”

ফারিহার মানুষটার জন্য একটু মায়া হলো। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, “আমি শাহরিয়ারের সাথে আপনার দেখা করিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কোনোভাবেই তাকে কিন্তু বলতে পারবেন না যে আমি দেখা করার ব্যবস্থা করেছি।”

“বলব না। আপনি নিশ্চিত থাকেন।”

“ঠিক আছে। আজকে বিকালবেলা শাহরিয়ারের সাথে আমার দেখা হবে গুলশানের একটা কাফেতে। আমি আপনাকে কাফের ঠিকানাটা দিয়ে দেব। সেখানে ঠিক বিকাল পাঁচটার সময় আসবেন।”

“আসব। অবশ্যই আসব।”

“আমাকে খুঁজে বের করবেন। আমার সাথে শাহরিয়ার থাকবে। আমাকে না চেনার ভান করে শাহরিয়ারের দিকে তাকিয়ে তাকে চিনে ফেলার ভান করবেন। তাকে মাঝে মাঝে টেলিভিশনে দেখিয়েছে তাই তাকে চিনে ফেলা এমন কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে না। “

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।”

“তখন তার সাথে আপনার যেসব কথা বলার দরকার সেগুলো বলতে পারেন। ‘

“গুড। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।”

“মনে থাকবে তো? আপনি যে আমাকে চেনেন সেটা যেন কোনোভাবেই শাহরিয়ার বুঝতে না পারে।”

“বুঝবে না। একদম বুঝবে না। আমি বুঝতেই দেব না।”

ফারিহা তখন কাফেটার ঠিকানা দিল। গাড়িতে ওঠার সময় দেখল একটু দূরে জুয়েলকে ঘিরে ছোট ছোট বাচ্চাদের বেশ বড় ভিড়। মনে হলো বেলুন ফাটানো নিয়ে সে এখন ছোট একটি ব্যবসাতে নেমে গেছে। ছেলেটি যথেষ্ট করিৎকর্মা।

বিকালবেলা ছোট্টাচ্চু কাফেতে বসে বিশ্বাদ একটা কফিতে চুমুক দিতে দিতে অপেক্ষা করছে। তখন ফারিহা এসে ঢুকল। ছোট্টাচ্চু কফিতে আরেকটা চুমুক দিয়ে মুখটা বিকৃত করে বলল, “এসেছো শেষ পর্যন্ত?”

ফারিহা বসতে বসতে বলল, “আসব না কেন?”

“তুমি না আসলে আমাকে এই তিতা-বিদঘুঁটে কফিটা খেয়ে যেতে হতো। ইয়াক থুঃ!”

ফারিহা হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, “তোমার যদি তেতো কফি ভালো না লাগে তাহলে সেটা খাও কেন?”

“তাহলে কী খাব?”

“যেটা খেতে ভালো লাগে। এখানে কত রকম কেক আছে, ক্রিমরোল আছে, আইসক্রিম আছে।”

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, “আমি একলা বসে বসে কেক খাব? কখনো শুনেছো একজন মানুষ একলা বসে বসে কেক খাচ্ছে?”

“তাহলে কিছু খাবে না। বসে থাকবে।”

“তুমি কখনো শুনেছো একজন মানুষ একটা কাফেতে এসে একলা একলা বসে আছে? শুনেছো?”

ফারিহা এবারে হাল ছেড়ে দিল। বলল, “ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। এখন আমি এসেছি। তুমি আর একলা নাই। কী খাবে বলো।”

“সবকিছু। কেক, ক্রিমরোল, আইসক্রিম, কফি। তুমি কী খাবে?”

ফারিহা বলল, “শুধু কফি।

“কফি একটা খাওয়ার জিনিস হলো?”

“কফি যদি খাওয়ার জিনিস না হয় তাহলে শুধু কফি খাওয়ার জন্য মানুষজন কাফে বানায় কেন?”

“মানুষের কি মাথার ঠিক আছে? মানুষ কী না করে! মার্ডার করার জন্য বোমা বানায়। সেই তুলনায় কাফে তো কিছুই না!”

ফারিহা চোখ বড় বড় করে বলল, “বুঝলে শাহরিয়ার, তোমার মনে হয় মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যতই তোমার কথা শুনি ততই অবাক হই।”

ছোট্টাছু মাথা নেড়ে বলল, “তুমি তো এখন আমাকে পান্ডা দিচ্ছ না। একদিন দেখবে মানুষ টিকিট কিনে আমার কথা শুনতে আসবে!”

ফারিহা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ঠিক আছে, সেই দিনের জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকব। এখন তুমি বসে থাকো, আমি তোমার জন্য খাবার অর্ডার দিই।”

“গুড।”

ফারিহা খাবার অর্ডার দিয়ে এলো। একজন প্লেটে করে টেবিলে খাবার দিয়ে যায়। ছোট্টাছু খুবই তৃপ্তি করে খেতে খেতে মাঝে মাঝে কফির মগে চুমুক দিচ্ছে এবং মুখ বিকৃত করে বলছে, “ইয়াক, থুঃ! মানুষ এটা খায় কেমন করে?”

ফারিহা সাবধানে ঘড়ির দিকে তাকাল। পাঁচটা বেজে গেছে। বয়স্ক মানুষটার এখন চলে আসার কথা। ঠিকভাবে শাহরিয়ারকে চেনার এবং তাকে না চেনার অভিনয়টুকু করতে পারলে রক্ষা।

ঠিক দশ মিনিট পর ফারিহা বয়স্ক মানুষটাকে ঢুকতে দেখল। মানুষটা কাফের ভেতর বসে থাকা মানুষগুলোকে লক্ষ করে। এই কাফেটা কমবয়সী মানুষের প্রিয় জায়গা। তাই কমবয়সী অনেকেই বসে বসে গল্পগুজব করছে। বয়স্ক মানুষটাকে

একটুখানি বিভ্রান্ত দেখা গেল, তখন হঠাৎ করে ফারিহা এবং ছোট্টাচ্চুর দিকে তাকাল। তারপর লম্বা পায়ে তাদের দিকে হেঁটে আসতে থাকল।

ফারিহা না দেখার ভান করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। চোখের কোনা দিয়ে দেখল বয়স্ক মানুষটা হেঁটে হেঁটে ফারিহা আর ছোট্টাচ্চুর টেবিলটার ঠিক আগের টেবিলে থেমে গেল। সেখানেও ফারিহার বয়সী এক মহিলা একজন মানুষকে নিয়ে বসে কফি খাচ্ছে।

ফারিহার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ থেমে যায়। সে শুনল বয়স্ক মানুষটা পাশের টেবিলে বসে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, “আপনি শাহরিয়ার সাহেব না? বিখ্যাত ডিটেকটিভ শাহরিয়ার? দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির ফাউন্ডার?”

বয়স্ক মানুষটা ফারিহার চেহারা ভুলে গিয়ে পাশের টেবিলের মহিলাকে ফারিহা মনে করেছে। কী সর্বনাশ!

পাশের টেবিলের মানুষটার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি এবং লম্বা চুল, চোখে কালো চশমা। সে মেঘ স্বরে বলল, “আমি শাহরিয়ার সাহেব না!”

“অফকোর্স, আপনি শাহরিয়ার সাহেব। আমি আপনাকে টেলিভিশনে দেখেছি।”

খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মানুষটা বলল, “আপনি কিছু একটা ভুল করেছেন। আমার নাম শাহরিয়ার না।”

বয়স্ক মানুষটা এবারে একটুখানি বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তখন টেবিলে বসে থাকা মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, “ম্যাডাম, আপনি যে বললেন আপনি শাহরিয়ার সাহেবকে নিয়ে বসবেন?”

মহিলা বলল, “আপনাকে আমি মোটেই কিছু বলি নাই। আপনার সাথে আমার কখনো দেখা হয় নাই। আপনি কে? কী জন্যে এসেছেন?”

ছোটাচ্চু কান খাড়া করে আলোচনাটা শুনছে। নিজের অজান্তেই তিন চার চুমুক কালো তিতকুটে বিশ্বাদ কফি খেয়ে ফেলেছে টের পর্যন্ত পায় নাই। বয়স্ক মানুষটার কথা শুনে ছোটাচ্চু এত অবাক হয়েছে যে সেটি আর বলার মতো নয়। মাথা ঘুরিয়ে ফারিহার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, “কী হচ্ছে এখানে?”

ফারিহা না শোনার ভান করে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোটাচ্চু আবার জিজ্ঞেস করল, “ফারিহা, কী হচ্ছে এখানে? ইনি কে? এখানে আমার খোঁজ করছেন কেন?”

ফারিহা উদাস গলায় বলল, “তুমি ডিটেকটিভ। তুমি খুঁজে বের করো।”

‘ডিটেকটিভ’ শব্দটি শুনে বয়স্ক মানুষটা ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, ফারিহাকে দেখল এবং হঠাৎ করে নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। মুখ কাঁচুমাচু করে পাশের টেবিলের মহিলাকে বলল, “সরি! ভুল হয়ে গেছে।”

তারপর ফারিহাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে আরও কাঁচুমাচু হয়ে ফারিহার দিকে তাকিয়ে বলল, “শাহরিয়ার সাহেবকে চিনে ফেলার অ্যাকাটিংটা কি আবার করব?”

ফারিহা বলল, “না, আর করতে হবে না। একবারই বেশি হয়ে গেছে।” ছোট্টাচ্চু বলল, “আমি শাহরিয়ার। আপনি আমাকে খুঁজছিলেন?”

“জি, খুঁজছিলাম। একটু বসি?”

“বসেন।”

বয়স্ক মানুষটা ছোট্টাচ্চুর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল। তারপর একবার ফারিহার দিকে আরেকবার ছোট্টাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসল। বলল, “বয়স হয়ে গিয়েছে তাই ব্রেনটা আউলা-ঝাউলা হয়ে গেছে। কোনো কাজ আর ঠিকমতো করতে পারি না। সব উল্টা-পাল্টা হয়ে যায়। এই ম্যাডামের বদলে ঐ ম্যাডামের কাছে চলে গিয়েছিলাম।”

ছোট্টাচ্চু চোখ ছোট ছোট করে ফারিহার দিকে তাকাল, বলল, “তুমি এখন আমার জন্য ক্লায়েন্ট খুঁজে বের করার কাজে লেগেছো?”

ফারিহা বলল, “মোটাই না! উনাকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি তোমার ঠিকানা দিয়েছি কি না।”

বয়স্ক মানুষ জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, “দেন নাই। ম্যাডাম দেন নাই। আমি অনেক অনুরোধ করেছি বলে এখানে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।”

ছোট্টাচ্চু জিজ্ঞেস করল, “আপনার সাথে দেখা হলো কোথায়?”

“আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি অফিসের সামনে।”

ছোটাচ্চু কেমন যেন চমকে উঠল, ফারিহার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি কি রেগুলার ঐখানে ক্লায়েন্ট খুঁজতে যাও?”

ফারিহা মাথা নাড়ল, বলল, “নাহ্।”

“তাহলে?”

“ভাগাতে যাই।’

বয়স্ক মানুষটা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, “ম্যাডাম নিজে কিছুই বলেন নাই। ছোট একটা ছেলে বেলুন নিয়ে—”

ছোটাচ্চু দুই হাতে তার মাথার চুল খামচে ধরে বলেন, “থাক থাক আমি আর শুনতে চাই না। শুনতে চাই না। “

ফারিহা বলল, “সেইটাই ভালো। তুমি বরং উনার কেসটা শোনো হেল্প করতে পারলে হেল্প করো, না পারলে বলে দাও পারবে না।”
বয়স্ক মানুষটা বলল, “জি, জি, আমার কেসটা শুনেন।” ছোটাচ্চু বলল, “আমি কেস নেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।”

“প্লিজ, প্লিজ, শুধু আমার কেসটা নেন। এই শেষ।”

ফারিহা বলল, “নেবে কি নেবে না সেটা পরে হবে। আগে শুনে নাও।”

ছোটাচ্চু লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “ঠিক আছে বলেন।”

বয়স্ক ভদ্রলোক তখন সোজা হয়ে নড়েচড়ে বসে বলতে শুরু করল, “আমার নাম এমদাদ হোসেন। রিটার্ড ব্যাংকার। অনেক দিন মিডল ইস্ট কাজ করে গত বছর ফিরে এসেছি। তিন ছেলে-মেয়ে, বড় ছেলে কানাডা, মেয়ে বিয়ে হয়ে আমেরিকা। ছোট

ছেলে কলেজে পড়ে। দেশে আমাদের সাথে থাকে। সমস্যাটা আমার এই ছেলেকে নিয়ে। যখন মিডল ইস্ট ছিলাম তার মা আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে নষ্ট করেছে। পুরোপুরি বখে গেছে। লেখাপড়া করে না। ফালতু কিছু বন্ধু আছে, তাদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। যখন বাসায় থাকে, ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ করে ফেসবুক করে।

এমদাদ হোসেন নামের রিটায়ার্ড ব্যাংকার একটা নিশ্বাস ফেলে থামল। ফারিহা বলল, “অনেক পুরানো গল্প। সব ফ্যামিলির এই রকম গল্প আছে।”

এমদাদ সাহেব বলল, “আমার অবস্থা একটু জটিল। আমার ছেলে কয়দিন আগে আমার কাছে এসে বলেছে তাকে একটা নূতন মোবাইল ফোন কিনে দিতে হবে। তা না হলে বন্ধুদের সামনে সে নাকি মুখ দেখাতে পারবে না। ফোনের দাম পঁচাত্তর হাজার টাকা। বুঝেছেন? পঁ-চা-ও-র হাজার টাকা!”

ছোট্টাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, “বুঝেছি।”

“খোদার ইচ্ছায় টাকা-পয়সার আমার সমস্যা নাই, তাই বলে আমি আমার কলেজে পড়া ছেলেকে পঁচাত্তর হাজার টাকার ফোন কিনে দেব? নেভার!

ফারিহা বলল, “আমার ছেলে হলে আমিও দিতাম না।”

“ছেলের তখন খুব রাগ। আমার ওয়াইফ আবার তার পক্ষে ওকালতি করে, বলে ছেলে একটা শখ করেছে তাকে কিনে দাও না, কী আর হবে। আমি রাজি হই না, তখন কি হলো জানেন?”

“কী হলো?”

“একদিন রাতে ছেলে আর বাড়ি ফিরে আসে না। দরজার নিচে একটা চিরকুট। চিরকুটে কি লেখা জানেন?”

“কী লেখা?”

এমদাদ সাহেব তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ছোটাছুঁর হাতে দিয়ে বলল, “আপনি নিজেই পড়ে দেখেন।”

কাগজটা হাতে নিয়ে প্রথমে ছোটাছুঁ, তারপর ফারিহা পড়ল। সেখানে লেখা :

আমি শীর্ষ সন্লাসি কালা জাহাঙ্গীর।
আপনার ছেলেবেলায় আমি হাইজেক করসি। যদি পচাত্তর হাজার টাকা না দেন আপনার ছেলেবেলায় মার্ডার করমু। খামের ভিতর পচাত্তর হাজার টাকা ভরে সিঁড়ির উপরে রাখেন। না হলে আপনার ছেলে ফিনিস। হা হা হা।

ফারিহা বলল, “অনেক বানান ভুল।”

ছোটাছুঁ বলল, “আপনি সন্দেহ করছেন এইটা আপনার ছেলে নিজেই লিখেছে?”

“তা না হলে কে লিখবে? কালা জাহাঙ্গীরের আর কাজ নাই? তাও চাইবে ঠিক পঁচাত্তর হাজার টাকা? এক টাকা কমও না, বেশিও না?”

“হাতের লেখা কী আপনার ছেলের?”

“একটু আঁকাবাঁকা করে লিখেছে, যেন বুঝতে না পারি। কিন্তু বোঝা যায় তারই হাতের লেখা।”

“আপনার ওয়াইফ কী বলেন?”

“এইটাই আমার মূল সমস্যা। ছেলেকে শীর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীর কিডন্যাপ করে নিয়েছে, এরকম কিছু হলে একজন মায়ের নার্ভাস ব্রেক ডাউন হওয়ার কথা, মাতম করার কথা। কিন্তু সে ভালোই আছে। কোনো দুশ্চিন্তা নাই। মাঝে মাঝে আমাকে বলে টাকাটা দিয়ে দিতে, এর বেশি কিছু না।”

“আপনি টাকা দিবেন না?”

“নেভার। পঁচাত্তর হাজার টাকা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে আকাশে উড়িয়ে দেব কিন্তু ফোন কেনার জন্য ছেলেকে দিব না।”

ছোটাচ্চু তার তিতকুটে কালো কফিতে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, “আপনি আমার কাছে কী চান, আমি কী করব?”

“আমার ছেলেটা কোথায় বের করে দেবেন। আমি কান ধরে টেনে বাসায় এনে—”

বাসায় এসে কী করবে সেটা বলার আগেই ছোটাচ্চু বলল, “আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার স্ত্রীই জানেন সে কোথায় আছে। তাকে জিজ্ঞেস করেন।”

“অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। সে বলে যে সে জানে না।”

“আপনার স্ত্রী যদি না বলেন তাহলে তো মুশকিল।”

এমদাদ সাহেব বলল, “প্লিজ আপনি আমার বাসায় এসে আমার ওয়াইফের সাথে একটু কথা বলেন। আমার ধারণা আপনি তার সাথে কথা বলে বের করে ফেলতে পারবেন। প্লিজ! প্লিজ!” বলে এমদাদ সাহেব তিতফুটে কফিসহ ছোটাচ্চুর হাত ধরে ফেলল।

ছোটাচ্চু সাবধানে নিজের হাতকে ছুটিয়ে বলল, “আপনার টেলিফোন নম্বরটা রেখে যান, আমি একটু চিন্তা করে দেখি।”

এমদাদ সাহেব ধরা গলায় বলল, “ছেলেটা পুরোপুরি নষ্ট হবার আগে একটু চেষ্টা করতে চাই।”

ছোটাচ্চু বলল, “আমি বুঝতে পারছি। তবু আমাকে একটু চিন্তা করতে দেন। আমি আসলে কেস নেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।”

এমদাদ সাহেব আরও কিছুক্ষণ অনুনয়-বিনুনয় করে শেষ পর্যন্ত তার পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ছোটাচ্চুর হাতে দিয়ে চলে গেল। ছোটাচ্চু তখন সরু চোখে ফারিহার দিকে তাকাল। বলল, “তুমি ঠিক কী শুরু করেছো ফারিহা?”

ফারিহা একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, “আমি ঠিক জানি না। যখনই এক রাস্তা দিয়ে যাই অফিসটা চোখে পড়ে, মাথাটা কেমন যেন গরম হয়ে যায়! মনে হয় অফিসটা গিয়ে জ্বালিয়ে দিই।”

ছোটাচ্চু নরম গলায় বলল, “প্লিজ ফারিহা, এই সরফরাজ কাফীর কথা ভুলে যাও। আমার যদি মাথা গরম না হয় তোমার কেন মাথা গরম হবে?”

ফারিহা কোনো কথা বলল না। মুখ শক্ত করে বসে রইল।

রাত্রি-বেলা সব বাচ্চাকাচ্চা দাদির (কিংবা নানির) ঘরে বসে ছটোপুটি করছে তখন ছোটাচ্চু এসে ঢুকল। বাচ্চারা তাদের ছটোপুটি থামিয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল। একজন বলল, “ছোটাচ্চু, কোনো কিছু আনো নাই?”

“কী আনব?”

“কেক। আইসক্রিমা।”

আরেকজন বলল, “ফ্রায়েড চিকেন? পিৎজা?”

আরেকজন বলল, “ছোটাচ্চু এখন কেমন করে আনবে? মনে নাই ছোটবু এখন বেকার।

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, “ঠিকই বলেছি। আমি এখন বেকার। এখন তোরা সবাই মিলে ছোটাচ্চু রক্ষা কমিটি তৈরি কর। তারপর আমার জন্য চাঁদা তুলে প্রত্যেকদিন আমার হাত খরচের টাকা তুলে দিবি।”

ছোটাচ্চুর কথা শুনে সবাই আনন্দে হি হি করে হাসল। শুধু একজন বলল, “উঁহু। আগে ছোটাচ্চু কেসের পিছনে ছুটত। এখন কেসগুলো ছোটাচ্চুর পিছনে ছুটে। ছোটাচ্চু উল্টা কেস নিতে চায় না। তাই না ছোটাচ্চু?”

ছোটাচ্চু কোনো কথা বলল না।

একজন ছোটাচ্চুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, “সত্যি ছোটাচ্চু।”

“মাঝে মাঝে সত্যি।”

“আজকে কোনো কেস পেয়েছে ছোটাচ্চু?”

“পেয়েছি। নিব কি না বুঝতে পারছি না।”

“কী কেস ছোটাচ্চু? ডাবল মার্ডার?”

“নাহ। একটা ছেলেকে কালা জাহাঙ্গীর কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। বলছে টাকা না দিলে মার্ডার করে ফেলবো।”

“সর্বনাশ!” এবারে সবাই এসে ছোটাচ্চুকে ঘিরে দাঁড়াল। একজন বলল, “কত বড় ছেলে ছোটাচ্চু? সত্যি মার্ডার করে ফেলবে? কীভাবে মার্ডার করবে? ডেডবন্ডি কী করবে?”

ছোটাচ্চু বলল, “ছেলেটার বাবা মনে করে ভুয়া কেস। নতুন মোবাইল কেনার জন্য ছেলে নিজেই লুকিয়ে আছে।”

বাচ্চাগুলো এবারে হতাশ হলো। মাথা নেড়ে বলল, “ধুর। মার্ডার কেস না হলে কেস নিও না ছোটাচ্চু।”

বাচ্চাগুলো আবার ছোটোপুটিতে ফিরে গেলে টুনি ছোটাচ্চুর কাছে এসে নিচু গলায় বলল, “ছোটাচ্চু।”

“উঁ।”

“তুমি কেসটা নিবে, প্লিজ!”

“কেন?”

“বুদ্ধির কেস আমার খুব ভালো লাগে। তুমি সবার সাথে কথা বলবে। তখন বের হয়ে আসবে কে কী করেছে।

“তুই কেমন করে জানিস?”

“সবসময় এরকম হয় না?”

“হয় নাকি?”

“হয় ছোটোচ্চু। প্লিজ কেসটা নাও!”

ছোটোচ্চু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “ঠিক আছে।”

টুনটুনি খুশিতে হাততালি দিয়ে বলল, “তুমি যখন সবার ইন্টারভিউ নেবে তখন আমাকে নিয়ে যাবে, প্লিজ!”

“তুই কী করবি?”

“দেখব। তুমি কীভাবে ইন্টারভিউ করো। প্লিজ ছোটোচ্চু প্লিজ! কতদিন আমি তোমার সাথে কোনো কেস করি না! আগে কত কেস করতাম মনে আছে?”

ছোটোচ্চু আবার একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “ঠিক আছে টুনি। বিকালবেলা রেডি থাকিস।”

পরদিন বিকালবেলা ছোটোচ্চু টুনিকে নিয়ে এমদাদ সাহেবের বাসায় হাজির হলো। পুরনো একটা দোতলা বাসা, বাসার সামনে গাছপালা। আজকাল এরকম বাসা দেখা যায় না, সবসময় বিশাল সাত তলা বিল্ডিংয়ে ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়। বাসার সামনে নুড়ি বিছানো রাস্তা এবং সেখানে সত্যিকারের গাড়ি বারান্দাও আছে। ছোটোচ্চু টুনিকে নিয়ে স্কুটারে করে এসেছে, তাই গাড়ি বারান্দাটা কোনো কাজে লাগল না।

বাসার সামনে পুরোনো আমলের দরজার পাশে পুরোনো আমলের কলিংবেল এবং সেটাতে চাপ দিতেই পুরোনো আমলের একটা শব্দ হলো। কিছুক্ষণ পর মোটাসোটা একজন কাজের মহিলা দরজা খুলে কেমন যেন চোখ পাকিয়ে তাকাল। বোঝাই যাচ্ছে এই বাসায় অনেক দিন ধরে কাজ করছে তাই বাসার মাঝে

কেমন যেন একটা মাতবরি করার অধিকার জন্মে গেছে। মোটামুটি কঠিন মুখে জিজ্ঞেস করল, “কাকে চান?”

ছোটাচ্চু বলল, “এমদাদ সাহেবকে বলেন শাহরিয়ার হাসান এসেছেন। ওনার সাথে এপয়েন্টমেন্ট করে এসেছি।”

এরকম সময়ে সাধারণত অতিথিকে ডেকে ভেতরে বসানো হয় কিন্তু মোটাসোটা মহিলা তার কোনো লক্ষণ দেখাল না। দরজাটা ঠিক মুখের ওপর বন্ধ করে দিল না কিন্তু চোখে-মুখে একটা বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়ে তাদেরকে দাঁড়া করিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকে গেল।

ভেতরে খবর যাওয়া মাত্রই এমদাদ সাহেব প্রায় ছুটে এসে তাদের দুইজনকে ভিতরে নিয়ে এসে বসাল। বাসা খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হয়েছে কি না, ট্রাফিক জ্যামে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না এই সব ভদ্রতার কথা বলতে লাগল।

ছোটাচ্চু সারা রাস্তা গজরগজর করতে করতে এসেছে কিন্তু এখন খুবই ভদ্রভাবে বলল তাদের আসতে কোনোই অসুবিধা হয় নাই।

মোটাসোটা মহিলা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, টুনি ভেবেছিল এমদাদ সাহেবের যত্নআত্তি দেখে এই মহিলা হয়তো তার ব্যবহারের জন্য একটু অপ্রস্তুত হবে। কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বরং মনে হলো সে ছোটাচ্চু এবং টুনির উপরে আরেকটু বিরক্ত হয়ে উঠল।

এমদাদ সাহেব ছোটাচ্চুর সাথে টুনিকে দেখে একটু অবাক হয়েছে, তাই ছোটাচ্চুকে বানিয়ে একটু ব্যাখ্যা দিতে হলো, নাচের

ব্লাস থেকে বাসায় নেওয়ার কেউ নাই, তাই ছোট্টাচ্চু তাকে নিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমদাদ সাহেব জানতে চাইল, বড়দের কথাবার্তা শুনে সে বিরক্ত হয়ে যাবে কি না, ইচ্ছা করলে টুনি ভিতরে গিয়ে টেলিভিশন দেখতে পারে।

টুনি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল সে সাথে গল্প বই নিয়ে এসেছে। কাউকে বিরক্ত না করে এবং নিজে বিরক্ত না হয়ে সে যতক্ষণ ইচ্ছা সময় কাটাতে পারবে।

টুনি তার ব্যাগ খুলে একটা মোটা ভূতের বই বের করে পড়ার ভান করে কান খাড়া করে সবার কথাবার্তা শুনতে আরম্ভ করল।

ছোট্টাচ্চু পকেট থেকে একটা ছোট নোট বই আর পেন্সিল বের করে এমদাদ সাহেবকে প্রশ্ন করতে শুরু করে। প্রথমে ছোট্টাচ্চু তথ্য, তারপর ঠিক কীভাবে কী ঘটেছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন। টুনি বেশ অবাক হয়ে দেখল ছোট্টাচ্চু আজকাল খুবই গুছিয়ে প্রশ্ন করা শিখে গেছে। একই প্রশ্ন কয়েকভাবে জিজ্ঞেস করে সেখান থেকে প্রশ্নের আসল উত্তরটা বের করে নেয়। ছোট্টাচ্চু যতক্ষণ প্রশ্ন করেছে টুনি ততক্ষণ তার বইয়ে মাথা গুঁজে রেখেছে কিন্তু চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ করে দেখল দরজার অন্য পাশে কাজের মহিলা এবং আরেকজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছে। এই ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই এমদাদ সাহেবের স্ত্রী। ছেলে কিডন্যাপ হয়ে যাওয়ার পরেও যার কোনো দৃষ্টিস্তা নাই।

এমদাদ সাহেবের সাথে দশ পনেরো মিনিট কথা বলে ছোট্টাচ্চু বলল এখন সে এমদাদ সাহেবের স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চায়। এমদাদ সাহেব তার স্ত্রীকে ডেকে আনতে গেল, মনে হলো চাপা গলায় একটু কথা কাটাকাটি হলো। তারপর এমদাদ সাহেবের স্ত্রী

এবং তার পিছু পিছু কাজের মহিলাটা ভিতরে ঢুকে। এমদাদ সাহেবের স্ত্রী সোফায় বসল, মোটাসোটা মহিলা ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে গেল, বোঝা গেল এবারে সে এখান থেকে নড়বে না।

ছোটাচ্চু এমদাদ সাহেবের স্ত্রীকে বলল, “আমি আসলে আপনার সাথে একা কথা বলতে চাচ্ছিলাম।”

এমদাদ সাহেবের স্ত্রী ছোটাচ্চুকে প্রায় একটা ধমক দিয়ে বলল, “একা কথা বলার কী আছে? যা বলার আছে সবার সামনে বলে ফেলেন।”

ছোটাচ্চু ধমক খেয়ে একটু বিরক্ত হলো, তাই এবারে প্রশ্ন করার মাঝে আর সূক্ষ্ম কারুকাজে গেল না, সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, “আপনার ছেলে কোথায় আছে আপনি জানেন?”

ভদ্রমহিলা একটু খতমত খেয়ে বলল, “না, জানি না।”

“আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি জানেন।”

ভদ্রমহিলা এবারে ছ্যাঁৎ করে উঠল, বলল, “না, আমি জানি না।” ছোটাচ্চু এবারে কাজের মহিলার দিকে ঘুরে বলল, “আপনি নিশ্চয়ই জানেন।”

কাজের মহিলা কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল, বলল, “আমি?”

“হ্যাঁ, আপনি। বলেন দেখি কোথায় আছে?”

“আমি-আমি-আমি কেমন করে বলব?”

“মনে করেন যখন ছেলেটাকে পাওয়া যাবে তখন যদি দেখা যায় আপনি আসলে জানতেন সে কোথায় আছে, তখন আপনি ঝামেলায় পড়বেন। এই বাসায় আপনার চাকরি থাকবে না। পুলিশ আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে।”

“পু-পু-পুলিশ? পুলিশ কেন?”

“একটা ছেলেকে কালা জাহাঙ্গীর হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে, আর পুলিশ জানবে না?”

মোটাসোটা মহিলাকে এবারে যথেষ্ট নার্ভাস দেখা গেল, এমদাদ সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, “বেগম সাহেব? কী বলে এইগুলো সত্যি নাকি? আমি কী –“

এমদাদ সাহেবের স্ত্রী তাকে কথা শেষ করতে দিল না। একটা ধমক দিয়ে বলল, “চোপ!”

কাজের মহিলা চুপ করে গেল। ছোট্টাচ্চু তখন আরও দুই-চারটা প্রশ্ন করে শেষ করে দিল। এমদাদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমরা এখন যাই। শুধু যাবার আগে আপনার ছেলের ঘরটা একটু দেখে যাই।”

কাজের মহিলা হঠাৎ কেমন যেন অস্থির হয়ে বলল, “আপনারা একটু দাঁড়ান, ছোট সাহেবের ঘরটা একটু পরিষ্কার করে দেই। খুবই ময়লা হয়ে আছে।”

ছোট্টাচ্চু বলল, “না, না। পরিষ্কার করবেন না। ঘরটা যেরকম আছে সেরকমই দেখতে চাই।”

এমদাদ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আসেন আমার সাথে।”

এমদাদ সাহেবের পিছু পিছু ছোটোচ্ছু ভিতরে যেতে শুরু করল। মাঝপথে থেমে গিয়ে পিছনে ফিরে তাকিয়ে বলল, “টুনি, তুই আসবি?”

টুনি ভান করল তার যাওয়ার ইচ্ছা নেই, কিন্তু ভদ্রতা করে শেষ পর্যন্ত যেতে রাজি হয়েছে। সে বই বন্ধ করে তাদের পিছু পিছু যেতে থাকে।

এমদাদ সাহেবের বাসাটা অনেক পুরোনো। দোতলা বাসার উপরের তলায় একটা ঘরে তার ছেলে থাকে। থাকার মতো আর কোনো ঘর নেই। এমদাদ সাহেব ঘরের ছিটকিনি খুলে ভিতরে ঢুকল। ষোলো-সতেরো বছরের একটা ছেলের ঘর যেরকম হওয়ার কথা, ঘরটা ঠিক সেরকম। দেওয়ালে বিদেশি হেভি মেটাল গায়কের পোস্টার। টেবিলে বইপত্র ছড়ানো। বিছানায় জামা-কাপড় পড়ে আছে। টুনি লক্ষ করল টেবিলের নিচে একটা প্লেট এবং দুটো বাটি। প্লেটে উচ্ছিষ্ট খাবার। একটা পানির বোতল। ছোটোচ্ছু বাথরুমে উঁকি দিল। পিছু পিছু টুনিও ঢুকল, বাথরুমের বেসিন ভেজা। গ্লাসে একটা টুথপেস্ট, টুথব্রাশ। টুনি হাত দিয়ে দেখল টুথব্রাশটা ভেজা, এটা আজকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ঘরে ঢুকলে যে কেউ বলতে পারবে এখানে একজন মানুষ থাকে। সেই মানুষটা কে সেটা আন্দাজ করতে হলে আইনস্টাইন হতে হবে না। শুধু তা-ই না, মানুষটা এই মুহূর্তে কোথায় লুকিয়ে আছে সেইটাও অনুমান করা যায়। এমদাদ সাহেবের স্ত্রী আর তাদের কাজের মহিলাটা ঘরে ঢুকেই যেভাবে একটা আলমারির সামনে পর্জিশন নিয়েছে সেটা দেখেই বোঝা যায় এর ভেতরেই ছেলেটা ঘাপটি মেরে আছে। এমদাদ সাহেব নিজে এটা কেন বুঝতে পারে নাই টুনি অনুমান করতে পারল না। কাউকে কোনোভাবে বিরক্ত না করে ছেলেটাকে কীভাবে বের করা যায় টুনি একটু চিন্তা করল। তারপর সে খটাশ করে তার ঘাড়ে একটা চাটি মারল।

যথেষ্ট জোরে এবং যথেষ্ট শব্দ করে। তারপর হাতটা চোখের সামনে এনে বলল, “সর্বনাশ!”

ছোট্টাছু জিজ্ঞেস করল, “সর্বনাশ? কী সর্বনাশ?”

টুনি বলল, “মশা!”

“মশা আবার সর্বনাশ হলো কীভাবে? বাংলাদেশ মানে মশা। মশা মানে হলো বাংলাদেশ।”

“এডিস মশা।”

“তাই নাকি?”

টুনি তার আঙুল থেকে কাল্পনিক মশাটা নিচে ফেলে বলল, “পত্রিকায় দেখো নাই নতুন ডেঙ্গু এসেছে?”

“এসেছে নাকি?”

“হ্যাঁ। হাফ ডেঙ্গু, হাফ চিকুনগুনিয়া, হাফ ম্যালেরিয়া।”

“তাই নাকি?”

টুনি বলল, “হ্যাঁ, ছোট্টাছু, খুবই ডেঙ্গুরাস। মশা কামড় দেওয়ার সাথে সাথে জ্বর, গিঁটে গিঁটে ব্যথা, আর প্লাটিলেট ঝপ করে অর্ধেক এডিস মশা খুবই ডেঙ্গুরাস।”

“তুই এডিস মশা চিনিস?”

“চিনব না কেন? দেখতে চিতাবাঘের মতো।” কথা শেষ করেই টুনি ছোটাচ্চুর গালে চটাশ করে একটা চড় মেরে দিল- বলল, “এই দেখো, আরেকটা।”

ছোটাচ্চু অবশ্য কিছুই দেখল না। গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, “পরের বার আমার গালে মশা মারার আগে আমাকে একটু ওয়ার্নিং দিস।

“ঠিক আছে। দিব।” বলে টুনি এদিক-সেদিক এডিস মশা খুঁজতে থাকে।

এমদাদ সাহেব, তার স্ত্রী এবং কাজের মহিলা একটুখানি বিস্ময় নিয়ে টুনির কাজকর্ম লক্ষ করছিল। টুনি তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, “এই রুমে তো ছয়-সাত দিন থেকে কেউ থাকে না, সেই জন্য এডিস মশা এভাবে বেড়েছে। মনে হয় কমোডের পানিতে লাভা হয়েছে।”

এই রুমে কেউ থাকে না কথাটা এমদাদ সাহেবের স্ত্রী এবং কাজের মহিলার খুব পছন্দ হলো। তারা জোরে জোরে মাথা নাড়ল। টুনি তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, “বাসায় কি মশার কয়েল আছে? এখানে একটা মশার কয়েল জ্বালিয়ে দেই?”

এমদাদ সাহেবের ছেলে খুঁজে বের করা থেকে হঠাৎ করে মশার কয়েল জ্বালানো কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল কেউই সেটা ভালো করে বুঝতে পারল না।

টুনি আবার জিজ্ঞেস করল, “আছে? আছে মশার কয়েল? আমি এই ঘরে জ্বালিয়ে দিয়ে যাই?”

ছোটাচ্চু বলল, “তোমার মশার কয়েল জ্বালাতে হবে না। আয় আমরা এখন যাই।”

সবাই ঘর থেকে একে একে বের হয়ে আসতে থাকে। টুনি আরও একবার চেষ্টা করল, “আছে মশার কয়েল? একটা হলেই হবে।”

কাজের মহিলা বলল, “আছে।”

“আমাকে দিবেন প্লিজ!”

এমদাদ সাহেবের স্ত্রী বলল, “এইভাবে চাইছে মেয়েটা, দিয়ে দাও একটা, জ্বালিয়ে দিক।”

কাজেই বাসার কাজের মহিলা নিচে নেমে এসে টুনিকে একটা মশার কয়েল দিল। টুনি সেই মশার কয়েল নিয়ে ছেলেটার রুমে গেল এবং মশার কয়েল জ্বালিয়ে নিচে ফিরে এলো। তবে একটা মশার কয়েল জ্বালাতে যেটুকু সময় লাগার কথা তার থেকে সময় যে বেশি লেগেছে সেটা ছোটাচ্চু ছাড়া আর কেউ লক্ষ্য করল না।

নিচে নেমে আসার পর ছোটখাটো ভদ্রতায় কথা শেষ করে যখন ছোটাচ্চু টুনিকে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ অত্যন্ত বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটল। সবাই শুনল দোতলায় ছেলের ঘরে কেউ একজন দুম দুম করে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, তার সাথে একজনের চিৎকার এবং বিকট কাশির শব্দ শোনা গেল।

এমদাদ সাহেবের স্ত্রী এবং কাজের মহিলা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল। এমদাদ সাহেব চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, “কী হচ্ছে?”

টুনি বলল, “আমি তো আপনার ছেলের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে এসেছি, সে মনে হয় বের হওয়ার চেষ্টা করছে।”

এমদাদ সাহেব চোখ কপালে তুলে বলল, “আমার ছেলে? সে বের হতে চাইছে? সে তার ঘরেই আছে?”

“মনে হয়।”

“সে এখন বের হতে চাইছে কেন?”

“ঘরের ভেতর মশার কয়েল জ্বালিয়ে এসেছিলাম। মনে হয় সেই জন্য।”

“একটা মশার কয়েল জ্বালালে সে বের হতে চাইবে কেন?”

টুনি অপরাধীর মতো বলল, “একটা জ্বলাইনি তো— চল্লিশটা জ্বালিয়েছি।”

এমদাদ সাহেব অবাক হয়ে বলল, “চল্লিশটা মশার কয়েল তুমি কোথায় পেয়েছো? তুমি তো একটা কয়েল নিয়ে গেছো।”

টুনি লাজুক মুখে বলল, “ঐ একটাকে বিশ টুকরা করে দুই পাশে জ্বালিয়ে দিয়েছি। চল্লিশটা হয়ে গেছে।”

এমদাদ সাহেব অবাক হয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল। ছোটোচ্চু বলল, “মনে হয় দরজাটা খুলে আপনার ছেলেকে বের করে আনা দরকার। ঘরটা মনে হয় এতক্ষণে গ্যাস চেম্বার হয়ে গেছে।”

এমদাদ সাহেব বলল, “আমি যাচ্ছি। দরজা খুলে নিয়ে আসছি। আজকে দেখা যাবে কত ধানে কত চাল! সোনার চান্দের শরীরে কত কেজি মাংস আর কত কেজি হাড়ি!”

এমদাদ সাহেব ছেলেকে ধরে আনতে যাওয়ার পর ছোট্টাচ্চু টুনির দিকে তাকাল, বলল, “এডিস মশার কথাটা ভুয়া?”

টুনি অপরাধীর মতো মথা নাড়ল।

“এই কায়দা না করে সোজাসুজি বললে কী হতো?”

টুনি এমদাদ সাহেবের স্ত্রী আর কাজের মহিলাকে দেখিয়ে বলল, “ওনারা দুইজন যেভাবে গার্ড দিচ্ছিলেন তাই বলতে সাহস পাই নাই।”

এরকম সময় এমদাদ সাহেব তার ছেলের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘরে নিয়ে আসে। সবাই শুনল হুঙ্কার দিয়ে এমদাদ সাহেব বলল, “কাল জাহাঙ্গীর হাইজ্যাক করেছে? কাল জাহাঙ্গীর? পঁচাত্তর হাজার টাকার জন্য কাল জাহাঙ্গীর তোকে হাইজ্যাক করেছে? পঁচাত্তর টাকার জন্যও তোকে কেউ হাইজ্যাক করবে না। বুঝেছিস তুই?”

ছোট্টাচ্চু বুঝতে পারল এখন এখানে থাকাটা তাদের জন্য মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, দরজার দিকে এগুতে এগুতে বলল, “আমরা এখন যাই?”

“এক সেকেন্ড—” বলে এমদাদ সাহেব এক হাতে ছেলের কান ধরে রেখে অন্য হাতে প্যান্টের পকেট থেকে একটা মোটা খাম বের করে ছোট্টাচ্চুর দিকে এগিয়ে বলল, “আপনার ফি।”

ছোট্টাচ্চু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, “কিন্তু আমরা তো ফি নিয়ে কোনো কথা বলি নাই।”

“আমি জানি। ভদ্রলোকেরা কখনো ফি নিয়ে কথা বলে না। শুধু শুনে রাখেন, কালা জাহাঙ্গীরকে টাকা দিতে হচ্ছে না আপনাকে দিতে পারছি সেইটাই আমার আনন্দ।”

“কিন্তু—”

“কোনো কিন্তু নাই। আপনার সাথে আরেক দিন কথা বলব। আজকে আমার এই মহা কামেল ছেলে আর তার মা আর খালার সাথে কথা বলার দিন। শুধু শেষ একটা কথা শুনে যান।”

ছোট্টাচ্চু বলল, “কী কথা?”

এমদাদ সাহেব ফিসফিস করে বলল, “শুধু আপনার এই ভাতিঝি থেকে সাবধান। সে মনে হয় আপনাকেও দুই চারবার বিক্রি করে ফেলতে পারবে।

ছোট্টাচ্চু হাসি গোপন করে বলল, “আমি জানি।”

টুনি না শোনার ভান করে উদাস মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

৪. জেলাইল ইউ ডিন

সন্ধ্যাবেলা সবাই পড়তে বসেছে। বসা পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু আসলেই পড়ছে কি না সেটা জানার কোনো উপায় নেই। পড়ক আর না-ই পড়ক, পড়ার সময়টা এখানে বসতে হবে সেইটা নিয়ম।

আজকে দেখা গেল শান্ত হাতে সবুজ রঙের এক টুকরো কাগজ নিয়ে সেটা দেখছে এবং মুখে টিং টিং ডিং ডিং করে শব্দ করছে।

বোঝাই যাচ্ছে সে চাইছে কেউ তাকে জিজ্ঞেস করুক তার হাতে এটা কী।

তাই শেষ পর্যন্ত টুনি জিজ্ঞেস করল, “শান্ত ভাইয়া, তোমার হাতে এইটা কী?”

শান্ত তার সব দাঁত বের করে হাসল, বলল, “এইটা হচ্ছে একটা টিকিটা।”

“কিসের টিকিটা?”

“ফেসবুক সেলিব্রেটি জেলাইল ইউ ডিনের মোটিভেশনাল স্পিচ। প্রমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, “জেলাইল ইউ ডিন কোন দেশের মানুষ? কোন ভাষায় স্পিচ দেবে?”

টুনি বলল, “আমার কি মনে হয় জানো প্রমি আপু?”

“কী?”

“জেলাইল ইউ ডিনের আসল নাম হচ্ছে জলীল উদ্দিন। এইটাকে স্টাইল করে বলে জেলাইল ইউ ডিন। নিশ্চয়ই বাংলায় স্পিচ দেবে।”

শান্ত ভুরু কুঁচকে তার টিকিটা উল্টেপাল্টে দেখল, তারপর মুখটা গম্ভীর করে মাথা নাড়ল। বলল, “টুনি ঠিকই বলেছে, টিকিটের উল্টা দিকে ছোট ছোট করে লেখা জলীল উদ্দিন। উচ্চারণ হচ্ছে জেলাইল উই ডিন।”

শাহানা জিজ্ঞেস করল, “জলীল উদ্দিনের নামের উচ্চারণ কেন জেলাইল ইউ ডিন?”

প্রমি বলল, “এটা ফেসবুক সেলিব্রেটিদের নিয়ম। সবকিছু স্টাইল করে করতে হবে।

শাহানা শান্তর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, “তোর হঠাৎ মোটিভেশনাল স্পিচ শোনার দরকার হলো কেন?”

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, “মোটিভেশনাল স্পিচ মানে কী?”

সবাই শান্তর দিকে তাকাল। শান্ত মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, “মোটিভেশনাল স্পিচ মানে অ্যাঁ অ্যাঁ—” তারপর থেমে গিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল।

শাহানা বলল, “কী হলো, থামলি কেন? কথা শেষ করো—”

শান্ত বলল, “মানে যেটা শুনলে মোটিভেশন হয়।”

টুম্পা এত সহজে মেনে নিল না। জিজ্ঞেস করল, “মোটিভেশন মানে কী?”

শান্ত খুবই বিরক্ত হয়ে বলল, “আমি এত কিছু বলতে পারব না।

“টুনি বলল, “আমি তোকে বুঝিয়ে দেই। মনে করো একজনের কোনো কিছুতে উৎসাহ নাই-”

“ভ্যাবলা টাইপের?”

“চাইলে বলতে পারিস। যদি কথাবার্তা বলে তাকে উৎসাহ দেওয়া যায় সেইটা হচ্ছে মোটিভেশনাল স্পিচ।”

টুম্পা বুঝে ফেলার মতো করে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, “বুঝেছি। ভ্যাবলাদের জন্য স্পিচ হচ্ছে মোটিভেশনাল স্পিচ। সেই জন্য শান্ত ভাইয়া শুনতে যাচ্ছে।”

শান্ত গরম হয়ে বলল, “আমি মোটেই ভ্যাবলাদের জন্য স্পিচ শুনতে যাচ্ছি না।”

“তাহলে কেন যাচ্ছ?”

“আমি যাচ্ছি- আমি যাচ্ছি-” বলে শান্ত আবার থেমে গেল।

টুম্পা হাল ছেড়ে দিল না, জিজ্ঞেস করল, “বলো, কেন যাচ্ছ?”

“সত্যি শুনতে চাস?”

“হ্যাঁ।”

শান্ত সবার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, “আমি ঠিক করেছি যে আমি মোটিভেশনাল স্পিকার হব। সেই জন্য কেউ মোটিভেশনাল স্পিচ দিলেই আমি সেটা শুনতে যাই। দেখতে চাই কেমন করে স্পিচ দিতে হয়।”

শান্তর কথা শুনে বড়রা শব্দ করে হাসল, ছোটরা শব্দ না করে হাসল, যারা বেশি ছোট তারা কী করবে বুঝতে না পেরে অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শান্ত মুখ শক্ত করে বলল, “তোমরা হাসছো কেন? ভাবছ আমি পারব না?”

শাহানা বলল, “মোটিভেশনাল স্পিচ মানে মানুষজনকে উৎসাহ দেওয়া। যারা জীবনে বড় কিছু করেছে তারা নিজেদের জীবনের

কথা বলে। অন্যরা সেটা শুনে উৎসাহ পায়! তুই তোর জীবনে কী করেছিস?”

শান্ত বলল, “আপু, তুমি দুনিয়ার কোনো খোঁজ রাখো না।”

শাহানা চোখ কপালে তুলে বলল, “আমি দুনিয়ার কোনো খোঁজ রাখি না? আমি প্রত্যেক দিন কয়টা পত্রিকা পড়ি তুই জানিস?”

“এইটাই সবচেয়ে বড় ভুল। আজকাল পত্রিকা পড়তে হয় না। দুনিয়ার খবর নিতে হয় ফেসবুকে। যারা পত্রিকা পড়ে তারা পুরনো মডেল। তোমাকে প্রথমে ফেসবুক সেলিব্রেটি হতে হবে। তাহলেই অন্যরা তোমার মোটিভেশনাল স্পিচ শুনবে।”

টুনি বলল, “শান্ত ভাইয়া, তুমি আমাদেরকে একটা মোটিভেশনাল স্পিচ শোনাবে?”

“সত্যি শুনতে চাস?”

“হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি শুনিয়ে দাও। আমার হোমওয়ার্ক বাকি আছে।”

“কিসের ওপর শুনবি?”

টুনি একটু অবাক হয়ে বলল, “তুমি কিসের ওপর জানো?”

“আত্মবিশ্বাস, ব্যবসায়ে সাফল্য, নেতৃত্ব, পারিবারিক বন্ধন, রোমান্স—”

শাহানা চমকে উঠে বলল, “তুই রোমান্সও জানিস?”

শান্ত বলল, “জানি। কিন্তু এখানে ছোটরা আছে, এটা নিয়ে মোটিভেশনাল স্পিচ দেওয়া যাবে না।”

টুনি বলল, “তুমি নেতৃত্ব নিয়ে বলো দেখি।”

শান্ত তখন তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল। প্রমি বলল, “তোমার দাঁড়াতে হবে না। বসে বসেই বল

শান্ত মাথা নাড়ল, বলল, “উঁহু। বসে বসে মোটিভেশনাল স্পিচ হয় না। দাঁড়িয়ে বলতে হয়।

“ঠিক আছে, বল।”

শান্ত ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বলল, “নেতৃত্বের কথা বলতে হলে সবার আগে বলতে হয় ভিক্টর ফারগুসনের কথা। তাঁর জন্ম ইতালির প্রত্যন্ত একটি গ্রামে। যখন তার বয়স ষোলো-”

শাহানা জিজ্ঞেস করল, “ভিক্টর ফারগুসন কে? তার কথা তুমি কোথায় পড়েছিস?”

“কোথাও পড়ি নাই।”

শাহানা অবাক হয়ে বলল, “তাহলে জানলি কেমন করে?”

“জানি না তো!”

“মানে?”

“আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি। মোটিভেশনাল স্পিচ দিতে হলে কিছু জানতে হয় না। সবকিছু বানিয়ে বানিয়ে বলা যায়—”

শাহানা কিছুক্ষণ শীতল চোখে শান্তর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মেঘ স্বরে বলল, “অনেক হয়েছে। তোকে আর

মোটিভেশনাল স্পিচ দিতে হবে না। বস। বসে হোম ওয়ার্ক শেষ কর।”

“তাহলে আমার স্পিচ শুনবে না?”

“না। শোনার শখ মিটে গেছে। এই যদি মোটিভেশনাল স্পিচের নমুনা হয় তাহলে দুনিয়ার কারো যেন কোনোদিন মোটিভেশনাল স্পিচ শুনতে না হয়।”

“কী আশ্চর্য!”

শাহানা মুখ শক্ত করে বলল, “পড়তে বস। বসে হোম ওয়ার্ক কর। করে আমাকে দেখা কী করেছিল।”

শান্ত বিরস মুখে গজগজ করতে লাগল, “এই বাসায় কারো কাছ থেকে কোনো কিছুতে কোনো উৎসাহ পাই না। খালি বড় হয়ে নেই তখন দেখো।”

দুই দিন পর শান্ত দুপুরবেলা সেজেগুজে বের হয়ে গেল। ঘণ্টা দুয়েক পরে সে আনন্দে ঝলমল করতে করতে ফিরে এলো। টুনি জিজ্ঞেস করল, “মোটিভেশনাল স্পিচ শুনে এসেছো?”

শান্ত হাত ভাঁজ করে একটা বাঁকুনি দিয়ে বলল, “ইয়েস-স্-স্!”

“কেমন ছিল?”

“একেবারে ফাটাফাটি।”

টুনি বলল, “গুড।” তারপর জিজ্ঞেস করল, “নতুন করে মোটিভেশান হয়েছে তোমার?”

“হয়নি আবার? কত কী শিখেছি তুই চিন্তা করতে পারবি না।”

“কী শিখেছো, বলবে একটু?”

শান্ত উৎসাহে হাত নেড়ে বলল, “যেমন মনে কর বই লেখা। কী রকম করে বেস্ট সেলার বই লিখতে হয় শিখে এসেছি।

“সত্যি?”

“হ্যাঁ।”

টুনি যথেষ্ট অবাক হলো। সে জেনে এসেছিল যে লেখকরা বই লেখে, কোনো কোনো বই পাঠকেরা পছন্দ করে তখন সেটা হয়তো বেস্ট সেলার হয়। কিন্তু বেস্ট সেলার হিসেবেই যে বই লেখা যায় সেটা সে জানত না। তাই জিজ্ঞেস করল, “কেমন করে বেস্ট সেলার বই লিখতে হয়?”

“খুবই সোজা। যা কিছু ভালো আছে সেগুলোকে গালি দিলেই বই বেস্ট সেলার হয়ে যায়। যত বড় বড় মানুষ আছে তাদের সম্পর্কে খারাপ খারাপ কথা লিখতে হয়।”

টুনি চোখ কপালে তুলে বলল, “ভালো মানুষ সম্পর্কে খারাপ খারাপ কথা লিখতে হয়?”

“হ্যাঁ।”

“যদি ভালো মানুষদের কোনো কিছু খারাপ না থাকে?”

“তাহলে বানিয়ে লিখতে হয়।”

“জলীল উদ্দিন তাই বলেছে?”

শান্ত গম্ভীর মুখে বলল, “জলীল উদ্দিন না, জেলাইল ইউ ডিন। সবাই তাকে জেলাইল ইউ ডিন ডাকে।

“সবার সামনে সে ভালো মানুষদের সম্পর্কে খারাপ কথা লিখতে বলেছে? বানিয়ে বানিয়ে?”

“সবার সামনে বলে নাই। পরে যখন আমি আলাদাভাবে তার বইয়ে অটোগ্রাফ নিয়েছি তখন বলেছে। আরও অনেক কিছু বলেছে।”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “আর কী বলেছে?”

“বই লিখলে সবসময় সেখানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বিরুদ্ধে লিখতে হয়। তাহলে বই বেস্ট সেলার হয়।”

“বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বিরুদ্ধে?”

“হ্যাঁ, যেমন মনে কর লিখতে হয় মানুষ আসলে চাঁদে যায় নাই। এটা ভুয়া।”

“চাঁদে যায় নাই?”

“হ্যাঁ। আর লিখতে হয় বিবর্তন ভুয়া। ডারউইন ভুয়া।”

“সত্যি?”

“হ্যাঁ। লিখতে হয় পৃথিবীতে এলিয়েন এসেছিল। “এলিয়েন?”

“হ্যাঁ। পৃথিবীটা গোল না, পৃথিবীটা আসলে চ্যাপ্টা। সেইটাও লেখা যায়।”

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, “শান্ত ভাইয়া। তোমার জেলাইল ইউ ডিন নিয়ে আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে। যে মানুষ এই রকম জিনিস দিয়ে বই লিখতে বলে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক না।”

শান্ত মুখ বাঁকা করে হাসল, বলল, “তুই বললেই হবে নাকি? তুই জানিস জেলাইল ভাই আমাকে টাকা রোজগার করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন?”

টুনি ভুরু কুঁচকে বলল, “তোমায় কী করতে হবে?”

“কিছুই করতে হবে না। “

“তোমার কিছুই করতে হবে না। আর তোমার টাকা রোজগার হবে?”

“হ্যাঁ।”

“তুমি আমাকে এটা বিশ্বাস করতে বললে?”

শান্ত মুখ বাঁকা করে বলল, “তুই বিশ্বাস না করলে নাই। তুই কি মনে করেছিস তোকে বিশ্বাস করানোর আমার ঠেকা পড়েছে?”

টুনি বলল, “না, পড়ে নাই। কিন্তু—”

“কিন্তু কী?”

“তোমার জেলাইল ইউ ডিন মানুষটাকে আমার একটুও সুবিধার মানুষ মনে হচ্ছে না। সে যদি তোমাকে টাকা কামাই করার ব্যবস্থা

করে দেয় সেটা নিশ্চয়ই দুই নম্বর! তুমি কোন বিপদে পড়বে কে জানে। তাছাড়া—”

“তাছাড়া কী?”

“তাছাড়া তুমি তো বড় হও নাই- স্কুলে পড়ো। তোমার তো এখান থেকে সেখান থেকে টাকা কামাই করার কথা না-”

শান্ত রেগে উঠল। বলল, “যেটা বুঝিস না সেইটা নিয়ে কথা বলিস না। আমাকে নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না।”

বলে সে পা দাপিয়ে চলে গেল।

শান্তকে নিয়ে টুনি সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকে। সবাই আশ্বে আশ্বে বড় হয়, শান্ত মনে হয় আশ্বে আশ্বে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক পরে শান্ত নিজেই টুনির কাছে ফেরত এলো। এসে বলল, “তুই আসলেই বিশ্বাস করিস না যে জেলাইল ভাই আমাকে টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন?”

“না। কোনো কাজ না করলে টাকা ইনকাম হয় না, তাহলে দুনিয়ার সবাই এইভাবে টাকা ইনকাম করত।”

“ঠিক আছে। কীভাবে আমার টাকা ইনকাম হবে তোকে বলি, কিন্তু তুই কাউকে বলতে পারবি না।”

টুনি তার চশমাটা ঠিক করে বলল, “যদি বেআইনি না হয় তাহলে কাউকে বলব না। “

শান্ত গরম হয়ে বলল, “বেআইনি কেন হবে? তোর ধারণা আমি বেআইনি কাজ করব?”

“না জেনে করতেও পারো।”

“আমাকে এত গাধা ভাবিস না।”

টুনি বলল, “ঠিক আছে, ভাবব না। এখন বলো।”

“তুই কিন্তু কাউকে বলতে পারবি না।”

“বলব না।”

“বল, খোদার কসম।”

“খোদার কসম।”

“জেলাইল ভাই অনেক চিন্তা করে এই টেকনিকটা আবিষ্কার করেছে। ফাটাফাটি বুদ্ধি। জেলাইল ভাই হচ্ছে একটা জিনিয়াস।”

টুনি ধৈর্য ধরে জিনিয়াস জেলাইল ভাইয়ের ফাটাফাটি বুদ্ধিটা শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

শান্ত বলল, “জেলাইল ভাই একটা ক্লাব তৈরি করেছে, সেইটার নাম জেলাইল ফ্যান ক্লাব। যে কেউ সেই ক্লাবের মেম্বার হতে পারবে। মেম্বারশিপ ফি মাসে মাত্র দশ টাকা। আর মজা কী জানিস সেই দশ টাকাটাও পরে উঠে আসবে।”

টুনি বলল, “বুঝতে পারছি।”

“মনে করো আমি এই ক্লাবের মেম্বার হলাম। আমাকে কি করতে হবে জানিস?”

টুনি বলল, “জানি।

শান্ত ভুরু কুঁচকাল, “আমি এখনও কিছু বলি নাই, তুই কেমন করে জানিস?”

“যেভাবে হোক জানি।”

শান্ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বলল, “বল দেখি কী করতে হবে?”

“তোমাকে অন্যদের মেম্বার করতে হবে। সেই মেম্বারদের আবার অন্যদের মেম্বার করতে হবে। তারা আবার অন্যদের মেম্বার করবে। “এইভাবে চলতে থাকবে।”

শান্তর চোয়ালটা যেন কেমন ঝুলে পড়ল। আমতা আমতা করে বলল, “তুই কেমন করে জেনেছিস?”

“তার কারণ এইটা তোমার জিনিয়াস জেলাইল ইউ ডিন ভাইয়ের আবিষ্কার না। এটা জুয়াচোর মানুষদের অনেক পুরানো টেকনিক। এটার নাম পিরামিড স্কিম।”

“পি-পিরামিড স্কিম?”

“হ্যাঁ। মেম্বাররা তাদের ফি দেবে যে তাকে মেম্বার করেছে তাকে। তারা কিছু টাকা নিজে রেখে বাকিটা দেবে যে তাকে মেম্বার করেছে তাকে। সে আবার সেই টাকার কিছু রেখে বাকিটা দিবে তাকে যে মেম্বার করেছে তাকে। এইভাবে চলতে থাকবে।”

শান্ত টুনির কথা শুনে এত অবাক হলো যে কথা বলতে ভুলে গেল। হাঁ করে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল।

টুনি বলল, “এইভাবে যদি দেখো, দেখবে সবচেয়ে বেশি টাকা আসবে যে সবার আগে মেস্বার করা শুরু করেছে তার কাছে। তোমার বেলায় জেলাইল ইউ ডিনের কাছে।”

শান্ত বলল, “বা বা বা—” কথাটা শেষ করতে পারল না।

“আর ঠকবে যারা সবচেয়ে পরে মেস্বার হয়েছে তারা। যেহেতু তারা এখনও কাউকে মেস্বার করে নাই তাই তারা কোনো টাকা পাবে না। কিন্তু তাদের টাকা আগের মেস্বাররা ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেলবে।”

শান্ত আবার কথা বলার চেষ্টা করল, বলল, “বা বা বা—” কিন্তু এবারেও কথা শেষ করতে পারল না।

টুনি বলল, “আসলে কেউই বেশি টাকা-পয়সা পাবে না। এই দুই নম্বুরি টেকনিক শুরু হওয়ার কয়দিন পরেই সবাই টের পেয়ে যাবে। তখন যারা মেস্বার করেছে তাদেরকে ধরে অন্যরা মার দিতে পারে। তুমি সাবধানে থেকো।”

শান্ত একেবারে চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ পর শুকনো মুখে বলল, “তার মানে তুই বলছিস এটা সবাই জানে?”

“হ্যাঁ। এটা সবাই জানে। আর সেই জন্য এটা বেআইনি। যারা শুরু করবে পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে যাবে। কমপক্ষে দশ দিনের রিমান্ড।”

“সত্যি?”

টুনি উদাস মুখে বলল, “আমার কথা বিশ্বাস না করলে গুগল ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করে দেখো।”

“গুগল ভাইয়া?”

“হ্যাঁ।” বলে টুনি তার চশমা ঠিক করে উঠে গেল। শান্ত মুখ হাঁ করে বসে রইল।

সপ্তাহ খানেক পর সবাই সন্দের পর পড়তে বসেছে। টুম্পার হাতে একটা খবরের কাগজ। সে কাগজটা নাড়তে নাড়তে বলল, “শান্ত ভাইয়া শান্ত ভাইয়া এই দেখো, পত্রিকায় তোমার জেলাইল ইউ ডিনের ছবি ছাপা হয়েছে।”

কোনো একটা বিচিত্র কারণে শান্ত ছবিটা দেখার কোনো আগ্রহ দেখাল না। তবে অন্যরা খবরের কাগজটা নিয়ে টানাটানি শুরু করল। একজন জোরে জোরে পড়তে শুরু করল, “প্রতারক জলীল উদ্দিন গ্রেপ্তার। উল্লেখ্য, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে তিনি জেলাইল ইউ ডিন নামে পরিচিত। পিরামিড স্কিম নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি সাধারণ মানুষের অর্থ আত্মসাতের সাথে জড়িত ছিলেন।...”

শান্ত হঠাৎ করে তার পাঠ্য বইয়ে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

৫. সাধারণ মেয়ে

ইয়াকুব স্যার বইটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন, “চীন পূর্ব-এশিয়ার একটি দেশ। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ- এর রাষ্ট্রীয় নাম গণপ্রজাতন্ত্রী চীন অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ...

যদি ক্লাসে এসে বইটা হাতে নিয়ে স্যার রিডিং পড়েই শোনাবেন তাহলে স্যারের ক্লাসে আসার দরকার কী? দপ্তরিকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিলেই হয়, সবাই এত পৃষ্ঠা থেকে এত পৃষ্ঠা রিডিং পড়ে নাও। তাহলে সবাই নিজেরা নিজেরা রিডিং পড়ে নেবে। স্যার অবশ্যি রিডিং পড়ানোর সময় মাঝে মাঝে অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ শব্দ করেন, সেই শব্দগুলো বইয়ে নাই। স্যার শুধু সেইটা বইয়ের বাইরে থেকে করেন। মনে হয় সেই জন্যেই স্যারের ক্লাসে আসতে হয়—ঠিক কোথায় কোথায় অ্যাঁ অ্যাঁ করতে হবে সেইটা আগে থেকে কেউ জানে না। টুনি স্যারের রিডিং শুনতে শুনতে অনুমান করার চেষ্টা করে ঠিক কোন কোন জায়গায় ইয়াকুব স্যার অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ করবেন—বেশিরভাগ সময়ে টুনির অনুমান মিলে না। মাঝে মাঝে যখন মিলে যায় তখন তার ইচ্ছা করে আনন্দে একটা চিৎকার দিতে—কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর সেটা করা সম্ভব না তাই টুনি বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ইয়াকুব স্যারের ক্লাস থেকে বিরক্তিকর কোনো ঘটনা পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি না টুনি চিন্তা করে পায় না। প্রথম পাঁচ মিনিট পরেই তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট এভাবে সময় কাটাতে হবে। কেমন করে সে এই সময়টা কাটাবে?

কাজেই সময় কাটানোর জন্য তাকে একটা খেলা আবিষ্কার করতে হয়। টুনি একেকদিন একেক ধরনের খেলা আবিষ্কার করে। আজকের খেলাটা খুবই সহজ। ক্লাসের একটা ছেলে কিংবা মেয়ের দিকে তাকায়, তারপরে কল্পনা করার চেষ্টা করে সে কী

ভাবছে। সে শুরু করল রাজুকে দিয়ে। রাজু তাদের ফাস্ট বয়। সে কী ভাবছে সেটা কল্পনা করা সহজ। সে নিশ্চয়ই ভাবছে, ক্লাসে চীন দেশ পড়ানোর কী আছে? আমি চীন দেশের সবকিছু জানি। এটা কত বড় দেশ, এই দেশে কতজন মানুষ, তারা কী করে, কী খায়, কেমন করে ঘুমায় সেটাও আমার মুখস্থ। ধুর! স্যার পড়াতে খুবই দেরি করছে। এত দেরিতে আমার পোষাবে না-তার চাইতে আমি নিজে অনেক ফাস্ট পুরা চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলি। মুখস্থ করে ফেলি। কণ্ঠস্থ করে ফেলি। ঠোঁটস্থ করে ফেলি। তারপর রাজু নিশ্চয়ই ঝড়ের বেগে পুরো বই শেষ করে ফেলেছে। রাজুর অসাধ্য কিছু নাই!

রাজুকে শেষ করে টুনি মৌটুসির দিকে তাকাল। মৌটুসি কী ভাবছে সেটা কল্পনা করা ইন্টারেস্টিং হবে। সে দেখতে সুন্দরী, পড়ালেখায় ভালো। শুধু পড়ালেখায় ভালো তা নয়। সে গান গাইতে পারে, আবৃত্তি করতে পারে, নাচতেও পারে। সমস্যা একটাই-সে অহঙ্কারী। কাজেই সে নিশ্চয়ই ভাবছে, ইশ! আজকে আমাকে দেখতে নিশ্চয়ই কত্তো সুন্দর লাগছে! একেবারে ফুলপরির মতো! স্যার কেন ভ্যাদর ভ্যাদর করছে? ভ্যাদর ভ্যাদর না করে চুপ করে থাকলেই তো আমি মিষ্টি গলায় একটা গান গাইতে পারতাম আর ক্লাসের সবার বুক হিংসায় ফেটে যেত! ইশ! আমার মতো সুন্দর কেউ নাই। লেখাপড়াতেও আমার থেকে ভালো কেউ নাই। আমি সবার সেরা। সবার সেরা সুন্দরী-মৌটুসী সুন্দরী! ইশ যদি আমার আয়নাটা বের করতে পারতাম তাহলে এক ঝলক নিজেকে দেখে নিতাম। আর বলতাম- আহা কী সুন্দর কী সুন্দর!

মৌটুসীকে শেষ করে টুনি সবুজের দিকে তাকাল। সবুজ হচ্ছে তাদের ক্লাসের মাস্তান। এক সময় দুষ্ট ছিল। এখন দুষ্ট থেকে প্রমোশন হয়ে পাজি হয়েছে! সে কী ভাবছে করছে সেটাও মনে

হয় কল্পনা করা যাবে। সে ভাবছে, ইশ! আমি কখন আরেকটু বড় হব? গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর নাকের নিচে মোচ কখন উঠবে? হাতে-পায়ে গুটি গুটি মাসল হবে আর আমি যখন খুশি যাকে ইচ্ছা তার নাকে গদাম করে ঘুষি মেরে দিতে পারব! স্যার কথা বলে বলে মেজাজটা গরম করে দিচ্ছে! যখন আমি শীর্ষ সন্ধানসী হব তখন কেউ কথা বলে বলে আমার মেজাজ গরম করে দিতে পারবে না। দিলেই আমি ধমক দিয়ে বলব, চোপ! সাথে সাথে সে চুপ করে যাবে। বড় হয়ে প্রথমেই আমি একটা পিস্তল কিনব। তারপর সেই পিস্তল দিয়ে ছিনতাই করব। কী মজাটাই না হবে! ছিনতাই করে যে টাকা হবে সেটা দিয়ে একটা দামি স্মার্ট ফোন কিনব। তারপর সেই স্মার্ট ফোন দিয়ে সেলফির পর সেলফি তুলব। কটাস কটাস কটাস...।

সবুজকে শেষ করে কাকে নিয়ে কল্পনা করার যখন চিন্তা করছে তখন সালমাকে চোখে পড়ল। সব ক্লাসেই সালমার মতো এক-দুইজন ছেলে কিংবা মেয়ে থাকে যারা কোনো কিছুতেই ভালো না। লেখাপড়াতে ভালো না, খেলাধুলাতে ভালো না। নাচ, গান, আবৃত্তিও করতে পারে না। ভালো করে কথাও বলতে পারে না। ক্লাসে যখন স্যার কিংবা ম্যাডাম কিছু জিজ্ঞেস করেন তখন তারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এমনভাবে স্যার কিংবা ম্যাডামের দিকে তাকায় যে দেখে মনে হয় বুঝি প্রশ্নটা বুঝতেই পারে নাই। স্যার কিংবা ম্যাডাম যখন বকা দিতে শুরু করে তখন তারা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্লাসে তাদের কোনো বন্ধু থাকে না। একা একা ক্লাসের পিছনে বসে থাকে। তাদের চেহারা হয় সাধারণ, জামা-কাপড় হয় সাধারণ, কাজকর্মও হয় সাধারণ। কখনোই কেউ তাদের আলাদা করে দেখে না। টুনি যখন সালমার দিকে তাকাল তখন তার মনে হলো আজকে প্রথম কেউ আলাদা করে তার দিকে তাকিয়েছে। রোল কল করার সময় প্রত্যেক দিন

তার নামটা ডাকা হয় বলে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তার নাম জানে।
এছাড়া কেউ কোনোদিন তার নামও জানতে পারত না।

টুনি কি কল্পনা করার চেষ্টা করবে সালমা কী ভাবছে? টুনি কয়েক
সেকেন্ড সালমার দিকে তাকিয়ে রইল তখন হঠাৎ করে দেখল
সালমার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর সে প্রাণপণে সেগুলো
খোলা রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। ঘুমে তার চোখ বন্ধ
হয়ে আসছে। মানুষ যখন বসে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়ে তখন
তাকে কী হাস্যকর দেখায়! টুনি সালমার দিকে তাকিয়ে রইল।
সালমার চোখ বন্ধ হয়ে মাথাটা নিচু হয়ে আসছে। সত্যি সত্যি যদি
ঘুমিয়ে যায় তাহলে একটা মজা হবে। সালমা হঠাৎ ধড়মড় করে
জেগে উঠল। তাকে কেউ দেখে ফেলেছে কি না সেটা বোঝার
জন্য এদিক-সেদিক তাকাল। তারপর নড়েচড়ে বসে ইয়াকুব
স্যারের অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ শোনার চেষ্টা করতে লাগল। টুনি দেখল
আবার সালমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে! কী হাস্যকর একটি দৃশ্য!
টুনি চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী
হয়।

কী কপাল, হঠাৎ করে ইয়াকুব স্যার মুখ তুলে তাকালেন আর
সালমাকে দেখে ফেললেন। স্যার তখন ধমক দিয়ে উঠলেন, “এই
মেয়ে! এই মেয়ে!”

সালমা একেবারে ধড়মড় করে জেগে উঠল, বিড়বিড় করে বলল,
“জি স্যার। জি স্যার।”

“তুমি ক্লাসে বসে ঘুমাচ্ছ কেন?”

সালমা মাথা নেড়ে বলল, “না স্যার, না স্যার— মানে স্যার —“না
মানে কী? সারা রাত কী করো? জেগে জেগে বাড়ি বাড়ি চুরি
করতে যাও?”

“না স্যার। না স্যার” বলে মেয়েটা বোকার মতো মাথা নাড়তে থাকে।

“খবরদার ক্লাসে বসে ঘুমাবে না। বেয়াদব মেয়ে—” বলে ইয়াকুব স্যার আবার অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ করে রিডিং পড়তে লাগলেন। ধমক খেয়ে সালমার ঘুমটা পুরোপুরি ভেঙে গেছে। এবার সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। কী ভাবছে এই মেয়েটা? পুরো ক্লাসের সামনে যখন কাউকে লজ্জা দেওয়া হয় তখন তার কেমন লাগে?

টুনি চিন্তা করে সেটা বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু হঠাৎ করে তার আর এই খেলাটা খেলার ইচ্ছা করল না। সময় কাটানোর জন্য এখন অন্য একটা খেলা আবিষ্কার করতে হবে। কী খেলা আবিষ্কার করা যায় টুনি বসে বসে সেটা ভাবতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত ইয়াকুব স্যারের ক্লাস শেষ হলো। তারপর নাসরীন ম্যাডামের ক্লাস, নাসরীন ম্যাডামের পর অঞ্জনা ম্যাডামের ক্লাস। টুনি সবার ক্লাস চলার সময়েই চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সারাক্ষণই সালমা ঘুমে ঢলে ঢলে পড়ছে। কোনো একটা কারণে মনে হয় এই মেয়েটা বাসায় ঘুমাতে পারেনি।

পরের দিন ভোরবেলা এসেমব্লির সময় হেড ম্যাডাম অনেক দিন পর পুরো স্কুলের সামনে একটা বিশাল লেকচার দিলেন। লেকচারের বিষয়বস্তু ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে হাজির না থাকা। ম্যাডাম বললেন, “আমি সেদিন সব ক্লাসের রিপোর্ট নিয়েছি, রিপোর্ট দেখে আমি হরিফাইড। আমি পেটরিফাইড।”

ম্যাডামের প্রিয় শব্দ হচ্ছে পেটরিফাইড। কিছু একটা হলেই এই ম্যাডাম ‘পেটরিফাইড’ হয়ে যান। প্রথম প্রথম ছাত্রছাত্রীরা

পেটরিফাইড শব্দের অর্থ জানত না। পরে ডিকশনারি দেখে বের করেছে পেটরিফাইড মানে পাথর হয়ে যাওয়া। কিছু একটা হলেই এই হেড ম্যাডাম জমে পাথর হয়ে যান!

ম্যাডাম বললেন, “আমি দেখলাম ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসে না। যদি স্কুলে না আসে তাহলে ছেলেমেয়েরা কোথায় যায়? কী করে? আমি সব ক্লাস টিচারদের বলেছি নিজেদের ক্লাসে ক্লাসে খোঁজ নিতে। কেউ হাজির না থাকলেই বাবা-মাকে ফোন করতে। যদি দেখা যায় বিনা কারণে অনুপস্থিত তার কপালে অনেক দুঃখ আছে আমি এখনই সাবধান করে দিলাম।” বলে হেড ম্যাডাম তার মুখটাকে ভয়ঙ্কর করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হেড ম্যাডাম আসলে খুবই হাসি-খুশি মানুষ, ছেলেমেয়েদের অনেক আদর করেন। তাই মুখটাকে ভয়ঙ্কর করার চেষ্টা করলেও সেটাকেও মোটেই ভয়ঙ্কর দেখাল না। বরং ম্যাডামের মুখ দেখে কে যেন খুকখুক করে হেসে ফেলল।

হেড ম্যাডাম চোখ পাকিয়ে বললেন, “কে হাসে? কে?”

কেউ স্বীকার করল না, শুধু সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চশমা পরা ছোট একটা ছেলে রিনরিনে গলার স্বরে জিজ্ঞাস করল “স্কুলে হাজির না থাকলে আপনি কী করবেন ম্যাডাম?”

“সেটা তোমরা সময় হলেই দেখবে। আমি আশা করব সেটা যেন তোমাদের কারো নিজের চোখে দেখতে না হয়।”

চশমা পরা রিনরিনে গলার ছেলেটা এবারে জিজ্ঞাস করল, “আর আমরা যদি সবাই ক্লাসে হাজির থাকি?”

ম্যাডামের মুখটা সাথে সাথে হাসি হাসি হয়ে গেল, ম্যাডাম বললেন, “তাহলে থাকবে তোমাদের জন্য পুরস্কার।”

এবারে অনেকেই জানতে চাইল, “কী পুরস্কার ম্যাডাম? কী পুরস্কার?”

একজন ম্যাডামকে বুদ্ধি দিল, “তাদের পরীক্ষা দিতে হবে না!”

ম্যাডাম হাসলেন, বললেন, “না, এত বড় পুরস্কার দেওয়া ঠিক হবে না! কিন্তু অন্য পুরস্কার দিতে পারি। যেমন মনে করো যদি দেখি কোনো ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে পরপর তিন দিন সবাই হাজির আছে তাহলে তারা এক দিন সবাই মিলে চিড়িয়াখানায় যেতে পারে, কিংবা মিউজিয়ামে যেতে পারে। কিংবা বইমেলায় যেতে পারে কিংবা পিকনিকে যেতে পারে। শুধু তা-ই না, আমাদের যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে সেই অনুষ্ঠানে তাদের ক্লাসকে পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে।

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা এবারে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

স্কুলের স্যার-ম্যাডামেরা অনেক কিছু বলেন। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর সেগুলো তাদের এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। তবে টুনিদের ক্লাসে রাজুর কথা আলাদা, তার কান দিয়ে সবকিছু ঢোকে এবং কোনোটাই অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যায় না। সবকিছুই তার ভেতরে জমা হয়ে থাকে। কাজেই সব ছেলেমেয়ের ক্লাসে হাজির থাকার ব্যাপারটা অন্য সবাই ভুলে গেলেও রাজুর মাথার মাঝে বিষয়টা পাকাপাকিভাবে ঢুকে গেল। যখনই ক্লাসের তিন-চারজন ছেলেমেয়ে এক জায়গায় হয়েছে তখনই রাজু বিড়বিড় করে বলেছে, “ব্যাপারটা আমাদের দেখা উচিত!”

অন্যেরা জিজ্ঞেস করেছে, “কী দেখা উচিত?”

“সবাই ক্লাসে হাজির থাকা।”

“ও।” বলে একজন একজন করে সরে পড়েছে। কীভাবে ক্লাসের সব ছেলেকে ক্লাসে হাজির করা যায় সেটা নিয়ে কারো খুব বেশি মাথা ব্যথা নেই।

শেষে একদিন রাজু টুনিকে বলল, “টুনি। তোর কি মনে হয় না আমাদের ক্লাসের সবার ক্লাসে হাজির থাকা উচিত?”

টুনি ভদ্রতা করে বলল, “উচিত।”

“আমরা যদি পরপর তিন দিন সবাই হাজির থাকি তাহলে আমরা মিউজিয়াম যেতে পারব।”

ক্লাসে তিন দিন হাজির না থেকেই যে কেউ যখন খুশি মিউজিয়ামে যেতে পারে। কিন্তু টুনি সেটা রাজুকে মনে করিয়ে দিল না।

রাজু বলল, “কিংবা আমরা পুরো ক্লাস মিলে চিড়িয়াখানায় যেতে পারি। একসাথে পুরো ক্লাস যেতে অন্য রকম আনন্দ।”

টুনি মাথা নাড়ল।

“আমাদের ক্লাসকে দেখে তখন অন্য ক্লাসের ছেলেমেয়েরাও পুরো ক্লাস হাজির থাকতে পারে।”

টুনি মাথা চুলকে বলল, “কিন্তু কাজটা অনেক কঠিন। ক্লাসে এতগুলো ছেলেমেয়ে, কারো না কারো ঝামেলা থাকবেই। কারো নিজের অসুখ, কারো মায়ের অসুখ, কারো ভাইয়ের বিয়ে, কেউ আবার ফাঁকিবাজ—”

রাজু মুখ শক্ত করে বলল, “এইটাই তো চ্যালেঞ্জ। আমরা চাইলেই পারব। পারব না?”

টুনি কী আর বলবে, মাথা নেড়ে বলল, “পারব।”

“তুই থাকবি আমায় সাথে। তুই আর আমি মিলে করে ফেলব।”

টুনি মিনমিন করে বলল, “ঠিক আছে।”

সত্যি সত্যি রাজু একদিন ক্লাসের মিটিং ডেকে ফেলল। টুনি ভেবেছিল মিটিংয়ে সে আর রাজু ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না। কিন্তু দেখা গেল অনেকেই আছে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার মোটুসীও আছে। মোটুসী থাকা মানেই বিপদের লক্ষণ, সে ক্লাসের কোনো কিছুতে থাকে না। নিশ্চয়ই এসেছে একটা ঝামেলা পাকানোর জন্য। কিন্তু একজন হাজির হলে তাকে তো আর বের করে দেওয়া যায় না। তাই তাকেও মিটিংয়ে রাখতে হলো। রাজু খুবই গম্ভীর হয়ে শুরু করল, “আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা সবাই সেদিন হেড ম্যাডামের কাছে শুনেছি—”

সবুজ রাজুকে থামিয়ে বলল, “মিটিংয়ে চা-নাস্তা দিবি না?”

রাজু থতমত খেয়ে বলল, “চা-নাস্তা?”

“হ্যাঁ। মিটিংয়ে সবসময় চা-নাস্তা দিতে হয়।”

রাজু এদিক-সেদিক তাকাল, টুনি বলল, “সবুজ তোর চা-নাস্তা খাওয়ার ইচ্ছা করলে ক্যান্টিনে গিয়ে খেয়ে আয়।”

সবুজ গজগজ করতে লাগল, “এইটা কী রকম মিটিং যে কোনো রকম চা-নাস্তা নাই। চা-নাস্তা ছাড়া আবার মিটিং হয় নাকি?”

সবুজের কথাকে কেউ বেশি পাত্তা দেয় না, তাই এখানেও কেউ পাত্তা দিল না। আবার মিটিং শুরু হয়ে গেল।

রাজু সবার আগে হেড ম্যাডামের কথা দিয়ে শুরু করল। এসেমব্লিতে সবার হাজির থাকার যে কথাটা হেড ম্যাডাম বলেছিলেন সেইটা যে কত জরুরি কথা সেইটা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলল।

সবুজ কথার মাঝখানে হাই তুলে বলল, “এই ভ্যাদর ভ্যাদর বাদ দিয়ে কী করতে চাস সেটা বলে ফ্যাল। চা-নাস্তা ছাড়া মিটিং লম্বা করে লাভ নাই।”

রাজু তখন ক্লাসের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা রিপোর্ট দিল। কারা ক্লাসে নিয়মিত হাজির থাকে কারা থাকে না তাদের নাম বলল। সবুজ সবচেয়ে কম হাজির থাকে শুনে গরম হয়ে বলল, “মিথ্যা কথা। আমি সব ক্লাসে হাজির থাকি। খোদার কসম। যদি হাজির না থাকি তাহলে বুঝতে হবে আমার চিকুনগুনিয়া না হলে ডেঙ্গু কিংবা টাইফয়েড হয়েছিল।” সবুজের কথা কেউ পাত্তা দেয় না। এবারেও দিল না।

রাজু তখন বলল যারা ক্লাসে কম হাজির থাকে তাদের সবাইকে খুব ভালো করে বোঝাতে হবে যেন তারা ক্লাসে আসে। তাহলেই সবাইকে নিয়ে আসা যাবে। রাজুর কথা শেষ হওয়ার পর অন্য সবাই কথা বলতে থাকে। সবাইকে কীভাবে ক্লাসে আনা যায় সেটা নিয়ে সবারই নিজের মতো একটা আইডিয়া আছে। সবচেয়ে আজব আইডিয়াটা ছিল সবুজের। সে বলল, সবাই যদি রাজি থাকে তাহলে যারা ক্লাসে আসতে চায় না সে তাদের বাসায় গিয়ে

গিয়ে হুমকি দিতে পারে। যে ক্লাসে না এলে সে তাদের ঠ্যাঙ ভেঙে দেবে। তবে এর জন্য একটু খরচাপাতি করতে হবে। যেহেতু সবুজের কথাকে কেউ পাত্তা দেয় না তাই তার এই কথাটাকেও কেউ পাত্তা দিল না।

তবে সবচেয়ে ভালো আইডিয়াটা বের হলো মাধুরীর মাথা থেকে। সে ক্লাসের সবচেয়ে শান্তশিষ্ট মেয়ে। সবকিছু ঠান্ডাভাবে চিন্তা করতে পারে। মাধুরী বলল, ক্লাসে এতগুলো ছেলেমেয়ে তাই কখনোই সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসা যাবে না। কাজেই আগে থেকে একটা দিন টার্গেট করতে হবে। তারপর সবাইকে সেই দিন হাজির করার চেষ্টা করতে হবে। যারা সাধারণত স্কুলে আসে না, আগে থেকে তাদের বাসায় যেতে হবে, একজন একজন করে তাদের সবার কাছ থেকে সেই দিন ক্লাসে হাজির থাকার কথা আদায় করে নিতে হবে। কেউ যদি বলে সে আসতে পারবে না তাহলে নতুন আরেকটা দিন ঠিক করতে হবে।

মাধুরীর আইডিয়াটা সবারই পছন্দ হলো। সবাই মিলে তখন তখনই একটা দিন ঠিক করে ফেলল। ঠিক হলো সেই দিন সবাইকে ক্লাসে হাজির করে নিয়ে আসা হবে। ক্লাসে সবাইকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে সেই দিন কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। কেউ যদি ক্লাসে না আসে তার বাসায় গিয়ে বলে আসতে হবে। রাজুর লিস্ট দেখে কে কাকে মনে করিয়ে দেবে সেই দায়িত্বটা ভাগাভাগি করে দেওয়া হলো।

টুনির ভাগে পড়ল সালমা। অনেকেই ভালো করে সালমাকে চিনতে পারল না, টুনির অবশ্য সমস্যা হলো না, ইয়াকুব স্যারের ক্লাসে সেদিন সে সালমাকে আলাদা করে লক্ষ্য করেছিল। ক্লাসে বসে বসে সে ঘুমিয়ে যাচ্ছিল, হয় তার ঘুম বেশি তা না হলে বাসায়

সে ঘুমায় না। তবে কারণ যেটাই হোক সে যে ক্লাসে কম আসে সে ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই।

যাই হোক, মিটিং যখন শেষ হলো তখন সবাই শুনল মোটুসী তার নাক দিয়ে কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ করল। শুধু তাই না, মুখটাও কেমন জানি বাঁকা করে সে খুবই খারাপ ধরনের একটা হাসির ভান করল। তখন হঠাৎ করে সবাই বুঝতে পারল এতক্ষণ ধরে যে সবাই নানা রকম কথা বলেছে তার মাঝে মোটুসী একটা কথাও বলে নাই। মুখ বন্ধ করে বসে ছিল।

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে মোটুসী?”

“তোমরা ভাবছো এইভাবে সবাইকে তোমরা ক্লাসে নিয়ে আসতে পারবে?”

ক্লাসের প্রায় সবাই একজন আরেকজনকে তুই করে বলে তবে মোটুসীর কথা আলাদা। সে বলতে গেলে প্রায় কারো সাথে মিশে না তাই কারো সাথেই তার আন্তরিক সম্পর্ক নেই। কেউ তাকে তুই করে বলে না, সেও কাউকে তুই করে বলে না।

মাধুরী বলল, “সবাইকে আনতে পারব কি না জানি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখি।”

“কোনোদিন পারবে না।” বলে মোটুসী আবার মুখ বাঁকা করে হাসল।

মাধুরী একটু অবাক হয়ে বলল, “কেন?”

“সবাই যদি হাজির থাকেও আমি সেদিন ইচ্ছা করে হাজির থাকব না!”

সবাই চমকে উঠে, বলে কী মৌটুসী? রাজু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কেন? তুমি হাজির থাকবে না কেন?”

“আমি তোমাদের সাথে নাই।”

“কেন? তুমি আমাদের সাথে নাই কেন?”

“তোমরা সবাই সবসময় আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করো, আমাকে হিংসা করো সেই জন্য আমি তোমাদের সাথে নাই। “

সবাই একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল। টুনি বলল, “কখন আমরা খারাপ ব্যবহার করলাম? হিংসা করলাম?”

মাধুরী বলল, “আমরা সবাই মিলে একটা কাজ করতে চাচ্ছি আর তুমি আমাদের সাথে থাকবে না?”

“না। তোমরা সবাই মিলে কী করছো? সব ভুল।”

মাধুরী অবাক হয়ে বলল, “ভুল?”

“হ্যাঁ, একটা মিটিং করেছো। সেই মিটিংয়ে কোনো সভাপতি পর্যন্ত নাই। কারো সিগনেচার নাও নাই। মিটিং করেছো। তার কোনো প্রমাণ পর্যন্ত নাই। এই মিটিংয়ের কথা মানতে হবে কে বলেছে? আমি মানি না।”

কথা শেষ করে মৌটুসী উঠে গটগট করে হেঁটে চলে গেল। অন্য সবাই হাঁ করে বসে থাকল! রাজু অনেকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, “এইটা কী হলো?”

মাধুরী বলল, “একজনও যদি রাজি না থাকে তাহলে হবে না। আর যদি ইচ্ছা করে কেউ না আসে তাহলে খামোখা সবাইকে হাজির করার চেষ্টা করে লাভ নেই। পুরো প্রজেক্ট ফেইল।”

সবুজ বলল, “বুঝেছি। আমার ঠ্যাঙ ভাঙা হুমকিটাই দিতে হবে। “ সত্যি কথা বলতে কী এই প্রথমবার অনেকের মনে হলো সবুজ হয়তো ঠিকই বলছে।

টুনি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল “তোরা অপেক্ষা কর। আমি একটু চেষ্টা করে দেখি। “

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, “কী চেষ্টা করবি?”

“দেখি মৌটুসীকে ফিরিয়ে আনা যায় কি না।”

রাজু হতাশভাবে মাথা নাড়ল, বলল, “লাভ নাই।”

“দেখি চেষ্টা করে, দরকার হলে বলব সে হচ্ছে সভাপতি!” মাধুরী বলল, “যেটা বলতে হয় সেটা বল। শুধু চেষ্টা করে দ্যাখ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারিস কি না।”

টুনি মৌটুসীকে খুঁজতে গেল। ক্লাস রুম থেকে বের হয়েই টুনি মৌটুসীকে দেখতে পেল। সে বারান্দার রেলিংয়ে হাত রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবছে। টুনি এগিয়ে গিয়ে বলল, “এই যে মৌটুসী, তোমার সাথে কথা আছে।”

মৌটুসী মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, টুনিকে দেখেই তার মুখ শক্ত হয়ে গেল। বলল, “কী কথা?”

“তুমি একেবারে হান্ড্রেড পারসেন্ট সত্যি কথা বলেছো।”

মৌটুসী খতমত খেয়ে গেল, চোখ বড় বড় করে বলল, “আ-আমি?”

“হ্যাঁ। তুমি যেটা বলেছো সেটা পুরোপুরি সত্যি। আমাদের মিটিংটার কিছুই হয় নাই। সব ভুলভাল।”

“ভুলভাল?”

“হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছো। একজন সভাপতি ছাড়া মিটিং করলে সেই মিটিং হয় না।”

মৌটুসী ভুরু কঁচকে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল, সে টুনির কথা ঠিক বুঝতে পারছে না।

টুনি বলল, “তাই আমরা ঠিক করেছি আমাদের মিটিংটার জন্য একজন সভাপতি ঠিক করে নিব।”

মৌটুসী জিজ্ঞেস করল, “কে হবে সভাপতি?”

“কেন? তুমি।”

মৌটুসী সরু চোখে তাকাল, বলল, “আমি? আমি কেন?”

“আর কে হবে? তুমি ছাড়া আর কেউ তো এগুলো জানে না। তুমিই তো প্রথম আমাদের বলেছ যে মিটিং করলে সভাপতি থাকতে হয়। সবার সিগনেচার নিতে হয়। আমরা তো এগুলো জানতামই না।”

মৌটুসী টুনির কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করল না। সন্দেহের চোখে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

মৌটুসীকে রাজি করিয়ে নিতে না পারলে তাদের পুরো প্রজেক্ট ভেসে যাবে। তাই টুনি এবারে অন্যভাবে চেষ্টা করল। বলল, “তোমাকে আমাদের সভাপতি করার আরেকটা কারণ আছে।”

“কী কারণ?”

“আমরা যদি পুরো ক্লাস পরপর তিন দিন হাজির থাকি তাহলে বার্ষিক পুরস্কারের দিন আমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্লাসের পক্ষ থেকে সেই পুরস্কারটা কে নেবে?”

“কে নেবে?”

“তুমি। শুনেছি টেলিভিশন চ্যালেন আসবে। এই চ্যানেলের সামনে আমরা কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলব! তুমি যদি থাকো তাহলে ঠিক করে পুরস্কারটা নিয়ে ঠিকভাবে কথাবার্তা বলতে পারবে –“

টেলিভিশন চ্যানেলের কথা শুনে মৌটুসী শেষ পর্যন্ত নরম হলো। টুনি তখন আরও কিছুক্ষণ আগড়ম-বাগড়ম কথা বলে মৌটুসীকে ক্লাস রুমে নিয়ে এল। একটা কাগজ বের করে তখন সেখানে সবাই সাইন করল। নামের শেষে মৌটুসীর নাম লিখে তার পাশে বড় বড় করে লেখা হলো সভাপতি। মৌটুসী তখন খুবই গম্ভীরভাবে সেখানে সাইন করল। যারা উপস্থিত ছিল তারা খুবই সাবধানে বুকের ভেতর থেকে স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলল। যে সভাপতি সে আর যা কিছুই করুক নিশ্চয়ই নিজের ক্লাসের সর্বনাশ করবে না!

ক্লাসের সবাইকে হাজির করার জন্য সামনের মঙ্গলবার দিনটা ঠিক করা হয়েছে। প্রথমে রাজুর উৎসাহে শুরু করা হয়েছিল। শুরু করার পর দেখা গেল পুরো ক্লাসেরই ব্যাপারটা নিয়ে উৎসাহ। সবুজ উৎসাহে টগবগ করছে। মৌটুসী পর্যন্ত আগ্রহ নিয়ে সবার সাথে কথাবার্তা বলছে। ক্লাসের প্রায় সবার সাথে কথা বলা হয়েছে। সবাই কথা দিয়েছে সামনের মঙ্গলবার তারা ক্লাসে হাজির থাকবে। শুধু সালমার সাথে এখনও যোগাযোগ করা যায়নি, সে অনেক দিন থেকে ক্লাসে আসছে না। তাই একদিন টুনি স্কুলের অফিস থেকে সালমার বাসার ঠিকানা লিখে নিল, ঠিক করল সে নিজেই সালমার বাসায় চলে যাবে। তাছাড়া মিটিংয়ে তাকেই সালমাকে ক্লাসে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

পরের দিন বিকালবেলা স্কুল ছুটির পর ঠিকানা হাতে নিয়ে সে সত্যি সত্যি সালমার বাসাটা খুঁজে বের করে ফেলল। ঢাকা শহরে এরকম বাসা আছে টুনি জানত না, অনেকগুলো বাসা পাশাপাশি। ইটের বাসা, কিন্তু টিনের ছাদ। বাসাগুলো গায়ে গায়ে লাগানো, তবে সবগুলো বাসার মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। বাসাগুলো ভেঙে কেন সেখানে বড় বিন্ডিং তুলে এখনও ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলেনি সেটাই আশ্চর্য!

টুনি ঠিকানাটা আরেকবার মিলিয়ে নিয়ে দরজার কড়া নাড়ল। বাসাটা পুরনো আমলের, দরজার সামনে সত্যি সত্যি দুটো গোল গোল কড়া। ভেতরে একটা বাচ্চার কান্না শোনা যাচ্ছিল। কড়া নাড়ানোয় শব্দের সাথে সাথে কান্না থেমে গেল। একটু পরে কেউ একজন ছিটকিনি খুলে দিল। টুনি দেখল তার সামনে সালমা দাঁড়িয়ে আছে, পরনে একটা চলচলে রং-ওঠা টি-শার্ট। চুলগুলো কেমন জানি অদ্ভুতভাবে মাথার উপর চূড়ার মতো বেঁধে রেখেছে। তার কপালে এবং নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

সালমা টুনিকে দেখে এত অবাক হলো যে সেটি বলার মতো নয়। মুখ হাঁ করে বলল, “টু-টুনি? তু-তুমি? মানে তু-তু-ই? আমার বাসায়?” টুনি মুখটা হাসি হাসি করে বলল, “হ্যাঁ আমি। তোর বাসায়। সমস্যা আছে?”

“না-না। সমস্যা কেন থাকবে?” সালমা দরজা থেকে সরে একেবারে টুনির হাত ধরে ভিতরে ঢোকাল। বলল, “কী আশ্চর্য!”

“এর মাঝে আশ্চর্যের কী আছে? আমি তোর বাসায় আসতে পারি না?”

তাদের কথা শুনে সাত আট বছরের একটা ছেলে ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে। ছেলেটার মাথায় এলোমেলো বড় বড় চুল। চোখের পানি এখনও শুকায়নি, মনে হয় তার কান্নার শব্দই টুনি শুনছিল।

সালমা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, “বাবু! মনে আছে তোকে বলেছিলাম আমাদের ক্লাসে একটা সত্যিকার ডিটেকটিভ আছে? যার মাথার মাঝে খালি বুদ্ধি আর বুদ্ধি? মনে আছে?”

ছেলেটা অনিশ্চিতের মতো মাথা নাড়ল। সালমা বলল, “সব-সময় তার ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়! এই হচ্ছে সেই মেয়ে? এর নাম হচ্ছে টুনি! আমাদের বাসায় এসেছে! চিন্তা করতে পারিস? কী মজা!”

টুনি একটু অবাক হয়ে সালমার দিকে তাকাল। সালমা ক্লাসে কোনোদিন নিজ থেকে মুখ ফুটে একটা শব্দ করে না। দেখে মনে হয় কথা বলতে পারে না, কিন্তু এখন কী সুন্দর করে তেজিভাবে ছোট ভাইটার সাথে কথা বলছে!

সালমা টুনির হাত ধরে ভেতরে নিয়ে আসে। ঘরের মাঝে একটা পুরোনো সোফা, এক পাশে বিছানা। বিছানায় এলোমেলো চাদর-বালিশ, সোফার উপর জামা-কাপড়, বই, ঘরের মেঝেতে একটা ভাঙা খেলনা, চায়ের কাপ, কাগজপত্র। সব মিলিয়ে কেমন জানি হতচ্ছাড়া পরিবেশ।

অন্য যে কেউ হলে এরকম অগোছালো এলোমেলো একটা বাসায় তার ক্লাসের একজন বন্ধু চলে এলে একটুখানি লজ্জা পেত কিন্তু মনে হলো সালমা লজ্জা পেল না, অপ্রস্তুতও হলো না। টুনির দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, “বাসার অবস্থাটা দেখেছিস? একেবারে বিকাল হয়ে গেছে, এখনও গোছাতে পারি নাই। তুই দুই মিনিট সময় দে। আমি ঠিক করে ফেলি।”

টুনি বলল, “না, না—আমার জন্য কিছুই ঠিক করতে হবে না। আমাদের বাসা সব সময় এরকম।”

সালমা তার মাঝে ঝটপট কাজ শুরু করে দিয়েছে। চোখের পলকে বিছানাটা ঠিক করে ফেলল। সোফার উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিস সরিয়ে ফেলল। মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিস তুলে ফেলল, ভেতর থেকে একটা ঝাড় নিয়ে এসে ঘরটা ঝাড় দিয়ে ফেলল, সত্যি সত্যি দুই মিনিটের মাঝে ঘরটা একেবারে ঝকঝক-তকতক করতে লাগল। মনে হয় মেয়েটা ম্যাজিক জানে! যখন সে ঘরটা পরিষ্কার করছিল তখন কিন্তু সে চুপ করে নেই, মুখে কথা বলে যাচ্ছিল, “বুঝলি টুনি, বাসার কিন্তু এরকম অবস্থা থাকে না। আমি পরিষ্কার করে ফেলি। কিন্তু বাবুটার কয়দিন থেকে জ্বর, তার মন-মেজাজ ভালো না, খেতে চায় না, দিন-রাত কাঁদে। তার পিছনেই সময় চলে যাচ্ছে। কী যে বাজে রকমের ভাইরাস বের হয়েছে, একবার ধরলে টানা দশ দিন

বিছানায়! হায় হায় আমি তখন থেকে নিজেই বকবক করে যাচ্ছি, তুই কিছু বলছিস না। হঠাৎ করে আমার বাসায় কেন? বাসাটা তুই খুঁজে বের করেছিস কেমন করে? কেউ তো খুঁজে পায় না!

টুনি বলল, “না, আমার বাসা খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধা হয় না। তুই অনেক দিন স্কুলে যাস না। সেই জন্য খোঁজ নিতে এসেছি।”

সালমা হি হি করে হাসল, বলল, “শুধু এই জন্য আসিসনি-অন্য কোনো কারণ আছে! আমি তো মাঝে মাঝেই স্কুলে যেতে পারি না তখন তো কেউ আমার খোঁজ নেয় না। আজকে নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে!”

টুনি একটু লজ্জা পেল তারপর মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ। আসলে অন্য আরেকটা কারণও আছে।”

“ঠিক আছে। অন্য কারণটা শুনব তোর কাছে। তার আগে বল তুই কী খাবি। স্কুল থেকে এসেছিস, তোর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।”

“না, না, আমায় খিদে পায় নাই।”

“মিছে কথা বলবি না, আমি যখন স্কুল থেকে বাসায় আসি তখন রান্নাসের মতো খিদে পায়।”

টুনি বলল, “তুই এত ব্যস্ত হবি না, আমার খাওয়া নিয়ে তোকে ব্যস্ত হতে হবে কেন?”

সালমা হাসল, বলল, “তাহলে কে ব্যস্ত হবে? তুই? জোহরা এফুনি স্কুল থেকে আসবে, দেখিস এসেই খাই খাই শুরু করবে—”

“জোহরা কে?”

“আমার ছোট বোন, আমরা তিন ভাই-বোন। “

“তোর আশু—”

“আমার আশু নাই। মরে গেছে। আশুটার কোনো আক্কেল নাই, ঠাস করে একদিন মরে গেল, এখন সব ঝামেলা আমার ওপর!”

টুনি একটা ধাক্কা খেল, সে অবাক হয়ে সালমার দিকে তাকিয়ে রইল। একটা বাসার সব ঝামেলা বারো তেরো বছরের একটা মেয়ের ওপর? তার বয়সী একটা মেয়েকে ছোট ভাই-বোনদের দেখে রাখতে হচ্ছে? হঠাৎ করে তার কাছে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। কেন এই মেয়েটা স্কুলে আসে না, কেন ক্লাসের মাঝে ঘুমে ঢলে পড়তে থাকে, কেন চোখের পলকে ঘর পরিষ্কার করে ফেলে, ছোট ভাইটাকে কেমন করে দেখে রাখে কোনো কিছুই বুঝতে বাকি থাকে না।

সালমা উঠে দাঁড়াল, বলল, “তুই আমাকে দুই মিনিট সময় দে। আমি তোর জন্য নুডলস তৈরি করে আনি, আমি খুব ভালো নুডলস তৈরি করতে পারি।* ”

টুনিও দাঁড়িয়ে গেল, বলল, “না, না—”

সালমা বলল, “তুই ভদ্রতা করে না না করছিস, জোহরা এসে তো কোনো ভদ্রতা করবে না, একটু দেরি হলেই জানটা খেয়ে ফেলবে। তুই দাঁড়া—”

টুনি বলল, “ঠিক আছে, আয় তাহলে আমি তোকে হেল্প করি—”

“তুই আমাকে হেল্প করবি?” বিষয়টা যেন খুবই মজার এরকম ভান করে সালমা হি হি করে হাসতে শুরু করে।

“কেন? আমি তোকে হেল্প করতে পারব না? দেখতে চাস?”

সালমা কয়েক সেকেন্ড টুনির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, “তোমার কথা অবশ্য আলাদা। ঠিক আছে আয়। রান্নাঘরের অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ, এখন পর্যন্ত বাসন ধোয়ার সময় পাই নাই।”

টুনি বলল, “আমি তোকে বাসন ধুতে হেল্প করব। আয়।”

সালমা টুনিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। ছোট ভাইটার হাতে একটা দুধের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বলল, “বাবু, ঝট করে দুধটা খেয়ে নে। তুই কিন্তু আর ছোট বাচ্চা না যে মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হবে।”

বাবু বলল, “আমার দুধ ভালো লাগে না।”

“দুধ কারো ভালো লাগে না, কিন্তু তারপরেও খেতে হয়। আশু কিন্তু ওপর থেকে দেখছে, দুধ না খেলে অনেক রাগ হবে—”

“আশু কখনো রাগ হয় না।”

“ঠিক আছে। অনেক দুঃখ পাবে—”

বাবু মনে হয় এই যুক্তিটা ফেলে দিতে পারল না। সে নাক কুঁচকে দুধের গ্লাসটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

সালমা নুডলস বানানোর জন্য চুলায় পানি গরম করতে দিয়ে বলল, “বাবু, এখন হাত-মুখ ধুয়ে ঝটপট কাপড় বদলে নে। তোমার বুদ্ধির কোনো প্রশ্ন থাকলে রেডি কর। এই টুনি আপুর মাথার মাঝে খালি বুদ্ধি গজগজ করছে, যেটা জিজ্ঞেস করবি সেটাই

বলে দেবে। কেমন করে ডাকাতের দল ধরেছে সেইটাও জিজ্ঞেস করতে পারিস-

টুনি ইতস্তত করে বলল, “আমি কখনো ডাকাতের দল ধরি নাই—”

“ঠিক আছে ধরিস নাই তো কী হয়েছে? ধরবি। অন্য কিছু তো ধরেছিস।”

টুনি রান্নাঘরে সালমার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখে মেয়েটা একেবারে মেশিনের মতো কাজ করে যাচ্ছে, একটা চুলার মাঝে নুডলস দিয়ে একটা সসপ্যানে দুটো ডিম ভেজে ফেলল। কোথা থেকে জানি মটরশুঁটি বের করে নুডলসের মাঝে দিয়ে দেয়। কথা বলতে বলতে কয়েকটা প্লেট ধুয়ে ফেলল। টুনি তখন সালমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে—তবে সে যতক্ষণে ছোট একটা কাজ করে দেয় সালমা তার ভেতর দশটা বড় বড় কাজ করে ফেলে।

নুডলস বানিয়ে শেষ করার আগে সত্যি সত্যি সালমার ছোট বোন জোহরা এসে গেল, লম্বায় প্রায় সালমার সমান, চোখে চশমা। সালমা জোহরাকে ডাকল, বলল, “জোহরা দেখে যা কে এসেছে!”

জোহরা রান্নাঘরে টুনিকে দেখে একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সালমা বলল, “বল দেখি এটা কে?”

জোহরা মাথা নাড়ল, বলল, “জানি না।”

সালমা একেবারে রাজ্য জয় করার ভঙ্গি করে বলল, “এ হচ্ছে টুনি। আমাদের ক্লাসে পড়ে, মাথার মাঝে খালি বুদ্ধি আর বুদ্ধি। সত্যিকারের ডিটেকটিভ—”

টুনি চেপ্টা করেও সালমাকে থামাতে পারল না। সালমা হাত উপরে তুলে বলল, “এ হচ্ছে বিখ্যাত ডিটেকটিভ টুনি। পত্রিকায় তার ওপর বিশাল ফিচার বের হয়েছিল!”

জোহরা বলল, “আর তুমি তাকে দিয়ে তোমার বাসন ধুইয়ে নিচ্ছ?”

সালমা বলল, “আমি কী করব? টুনি জোর করল সে আমাকে হেল্প করবে।”

টুনি বলল, “আমি আসলে কিছুই করছি না। হেল্প করার ভান করছি।”

সালমা বলল, “অনেক হয়েছে, এখন আর কিছুই করতে হবে না। সবাই আয় আমরা নুডলস খাব।”

তারপর টেবিলে বসে সবাই নুডলস খেল, সালমা ভুল বলেনি সত্যি সত্যি নুডলসটা খেতে অনেক মজা হয়েছে। খাওয়ার পর সালমা জোহরা আর বাবুকে বাইরে খেলতে পাঠিয়ে দিল। তখন টুনি প্রথমবার সালমার সাথে নিরিবিলা কথা বলার সুযোগ পেল। সালমা এক গাদা কাপড় নিয়ে টুনির পাশে বসে। কাপড়গুলো ভাঁজ করতে করতে টুনিকে বলল, “এখন বল, তুই কেন এসেছিস?”

টুনি বলল, “যখন আমি এসেছিলাম তখন মনে হয়েছিল কাজটা খুব ইম্পরট্যান্ট। তোকে দেখে এখন কাজটা আর ইম্পরট্যান্ট মনে হচ্ছে না।”

সালমা বলল, “তবু শুনি।”

টুনি তখন পুরো ক্লাসের সব ছেলেমেয়েকে সামনের মঞ্জলবার হাজির করার প্রজেক্টের কথাটা বলল। সবার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে শুধু সালমার সাথে যোগাযোগ করা হয়নি বলে সে তাকে জানাতে এসেছে।

সালমা বলল, “ততদিনে বাবুর জ্বর কমে যাবে– তোরা চিন্তা করিস না, আমি চলে আসব।”

টুনি বলল, “আসতে পারলে আসবি, না পারলে নাই! তুই আমার সমান কিন্তু তোকে তোর বাসার সবকিছু দেখতে হচ্ছে এটা কি বিশ্বাস করা সম্ভব? আমি যদি আজকে নিজের চোখে না দেখতাম আমি কি বিশ্বাস করতাম? কেমন করে করছিস?”

হঠাৎ করে সালমার মুখটা কেমন যেন দুঃখী দুঃখী হয়ে যায়। এই প্রথমবার ভাঙা গলায় বলল, “পারছি না রে! সত্যি আমি পারছি না! বুঝলি টুনি, আশু যেদিন মরে গেল আমি সেদিনও কাঁদার সময় পাই নাই। আমার আবুটা জানি কেমন হয়ে গেছে। অফিস থেকে বের হয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে- অনেক রাতে বাসায় এসে চুপচাপ বসে থাকে। বাবুটা এখনও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে নাই–আমি স্কুলে যাওয়ার সময় পাই না, ঘুমানোর সময় পাই না। আমি কী করব, বল?”

টুনি সালমার গায়ে হাত দিয়ে বলল, “ঠিক হয়ে যাবে সালমা, দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে– তুই কত ভালো করে সবকিছু করছিস!”

“সারাদিন আমি সবার সাথে মজা করি, হাসাহাসি করি। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে যায় আমি বালিশে মুখ চেপে কাঁদি আর আশুকে গালি দেই-আশু তুমি কেমন করে এটা করতে পারলে? কেমন করে পারলে?”

টুনি আবার বলল, “সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে।”

“হবে না। আমি জানি। কেমন করে হবে? আমার লেখাপড়া হবে না। দেখি বাবু আর জোহরার লেখাপড়াটা ঠিক করে করাতে পারি কি না-তিনজনের ভিতর দুইজন খারাপ কী?”

টুনি যখন বাসায় ফিরে এলো পুরো রাস্তাটা তার মনে হলো সালমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে, “হবে না! হবে না! আমার লেখাপড়া হবে না। লেখাপড়া হবে না।”

পরদিন স্কুলে এসেই টুনি তাদের হেড ম্যাডামের ঘরে উঁকি দিল। ম্যাডাম গম্ভীর মুখে কী একটা কাগজ দেখছিলেন। টুনি পর্দা সরিয়ে মাথা ঢুকিয়ে বলল, “আসতে পারি ম্যাডাম?”

ম্যাডাম চশমার উপর দিয়ে টুনির দিকে তাকালেন, তারপর একটু অবাক হয়ে বললেন, “আসো।”

হেড ম্যাডাম হাসি-খুশি মানুষ, ছেলেমেয়েদের আদর করেন। কিন্তু তারপরও ছাত্রছাত্রীরা যখন খুশি তার অফিসে ঢোকার সাহস পায় না।

টুনি ভিতরে ঢুকে হেড ম্যাডামের কাছে গিয়ে বলল, “ম্যাডাম আমি আপনার সাথে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই।”

“কী বিষয়?”

“আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে নিয়ে কথা বলতে চাই।”

“কী হয়েছে সেই মেয়ের?”

টুনি এক সেকেন্ড চিন্তা করল, তারপর বলল, “এই মেয়েটা আমাদের ক্লাসে পড়ে। তার আশু হঠাৎ করে মারা গেছেন। এখন বাসার সবার দায়িত্ব তার ওপর। তার আব্বু থেকে শুরু করে ছোট ভাই-বোন সবার। সবাইকে তার দেখে শুনে রাখতে হয়, রান্না করতে হয়, বাসন ধুতে হয়। ছোট ভাইয়ের অসুখ হলে দেখতে হয়। সবাইকে সান্ত্বনা দিতে হয়। সে এখন স্কুলে আসার সময় পায় না, লেখাপাড়া করার সময় পায় না। মনে হয় আর লেখাপড়া করতে পারবে না। “

হেড ম্যাডাম কিছুক্ষণ টুনির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কেমন করে জানো?”

“আমি তার বাসায় গিয়েছিলাম। নিজের চোখে দেখেছি ম্যাডাম।
*

ম্যাডাম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। টুনির সাথে সালমাকে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, “থ্যাঙ্ক ইউ আমাকে এটা জানানোর জন্য। মেয়েটার নাম- ঠিকানা দিয়ে যাও। আমি দেখব।”

“সে কি আবার পড়াশোনা করতে পারবে ম্যাডাম?”

“পারবে। অবশ্যই পারবে। আমাদের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।”

“থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।”

টুনি একটা কাগজে সালমার নাম-ঠিকানা লিখে চলে আসার পর ম্যাডাম কাগজের টুকরাটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

পরের মঙ্গলবার সত্যি সত্যি টুনিদের ক্লাসের সব ছাত্র-ছাত্রী হাজির হলো। ছেলেমেয়েরা তাদের ক্লাস টিচারকে সেটা জানিয়ে দিল। ক্লাস টিচার সেটা হেড ম্যাডামকে জানালেন। স্কুল অ্যাসেমব্লিতে সেটা ঘোষণা করা হলো। শুধু তাই-না, সবার আগে পুরো ক্লাসকে হাজির করার জন্য টুনিদের পুরো ক্লাসকে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে একটা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে হেড ম্যাডাম একটা ঘোষণা দিলেন। টুনিদের পুরো ক্লাস তখন একটা গগন বিদারি চিৎকার দিল।

টুনি ক্লাস করতে করতে মাঝে মাঝেই সালমাকে লক্ষ করল। আজকে সে একটু পরে পরে ঘুমে ঢলে পড়ছে না। মাঝে মাঝে তার টুনির সাথে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল, তখন সালমা তার দিকে তাকিয়ে হাসল। কেন হাসল কে জানে!

স্কুল ছুটির পর যখন সবাই ক্লাস থেকে বের হচ্ছে তখন সালমা হঠাৎ টুনির কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, “টুনি, হেড ম্যাডাম আজকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।”

“কী বলেছেন?”

“অনেক কিছুর” বলে সে দাঁত বের করে হাসল। তারপর বলল, “তুই ম্যাডামকে সবকিছু বলেছিস?”

টুনি মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ, বলেছি।”

“ম্যাডাম বলেছে আজ রাতে বাসায় গিয়ে আব্বুর সাথে কথা বলবে।

টুনি বলল, “গুড।”

“ম্যাডাম বলেছেন, সবকিছু ঠিক করে দেবেন।

টুনি বলল, “ভেরি গুড।”

“আমাকে বলেছেন আমি যেন কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা না করি।”

টুনি বলল, “ভেরি ভেরি গুড।”

দুই সপ্তাহ পরে স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে বিশাল উত্তেজনা। গত কয়েক সপ্তাহ নানা ধরনের প্রতিযোগিতা হয়েছে তার পুরস্কার বিতরণী। এই দিনগুলোতে অহঙ্কারে মৌটুসীর পা মাটিতে পড়ে না। পড়ালেখায় সে রাজুর সাথে পারে না, কিন্তু অন্য সবকিছুতে সে প্রথম। নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সংগীত, কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা সবকিছুতে সে চ্যাম্পিয়ন। প্রতি বছর চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন্স পুরস্কারটা সে পায়। এই বছর সভাপতি হিসেবে পুরো ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাই হাজির থাকার পুরস্কারটাও সে নেবে। এত পুরস্কার সে কেমন করে নেবে কে জানে!

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে টেবিলের উপর পুরস্কারগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মৌটুসী অনুমান করার চেষ্টা করতে থাকে এর মাঝে সে কোনটা কোনটা নেবে।

সবাই এসে গেছে তবুও অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে না। কারণ প্রধান অতিথি তখনও এসে পৌঁছাননি! শেষ পর্যন্ত প্রধান অতিথি এসে হাজির হলেন। তখন অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রথমে বক্তৃতা। একজনের পর একজন বক্তৃতা দিয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা দাঁতে দাঁত চেপে কোনোভাবে সেই বক্তৃতা শুনে গেল! সবার শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতা। পুরস্কার পাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ না, অংশগ্রহণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ— প্রধান অতিথি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই

কথাটা অনেক বার বললেন। তার কথাটা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করল না। সব পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেই এই কথাটা সবসময় বলা হয়। কিন্তু সবাই জানে এটা বলা হয় শুধুমাত্র ভদ্রতা করে। যারা কখনো পুরস্কার পায় না তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে যে আসলে পুরস্কার পাওয়াটাই বড় কথা, অংশগ্রহণ করার কোনো গুরুত্ব নাই! সে জন্য যারা পুরস্কার পায় না হিংসায় তাদের বুকটা ফেটে যায়। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটা মোটেও আনন্দের অনুষ্ঠান না, এটা হচ্ছে মন খারাপ করা অনুষ্ঠান। যারা পুরস্কার পায় সেরকম অল্প কয়জনের জন্য আনন্দ, অন্য সবার জন্য মন খারাপের ব্যবস্থা।

প্রধান অতিথির লম্বা বক্তৃতা শেষ হলো তারপর পুরস্কার দেওয়া শুরু হলো। একেবারে ছোট ক্লাস থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বড় ক্লাসের ছেলেমেয়েদের জন্য পুরস্কার। যখন নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতার জন্য পুরস্কার দেওয়া শুরু হলো তখন মৌটুসী ঘন ঘন স্টেজে উঠতে এবং নামতে লাগল। এতবার সে পুরস্কার পেল যে প্রধান অতিথি পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন।

সব পুরস্কার বিতরণ শেষ হওয়ার পর সবাই হাজির থাকার জন্য টুনিদের ক্লাসের বিশেষ পুরস্কার। হেড ম্যাডাম তখন তাদের ক্লাসের কয়েকজনকে চলে আসতে বললেন, তখন মৌটুসীর সাথে রাজু আর মাধুরীও উঠে গেল। মৌটুসীর ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হলো না, কিন্তু সে কী আর করবে? সবুজকে কেউ ডাকে নাই কিন্তু কীভাবে কীভাবে সেও মঞ্চে উঠে গেল। শুধু তা-ই না, সবার সামনে দাঁড়িয়ে প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কারটা নিয়ে নিল! মৌটুসী যা বিরক্ত হলো সেটা আর বলার মতো নয়। কিন্তু স্টেজে দাঁড়িয়ে তো আর কাড়াকাড়ি করতে পারে না তাই মৌটুসীকে সেটা হজম করতে হলো! তবে সে বিষয়টা সহ্য করল

কারণ এর পরেই দেওয়া হবে চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন্স পুরস্কার। মোটুসী হিসাব করে বের করেছে এটা তার ছাড়া আর কারো পাওয়ার কথা না। তারপরও এটা যেহেতু আগে থেকে ঘোষণা করা হয় না তাই প্রতি বছরই পুরস্কারটা কে পাবে সেটা নিয়ে সবার একটা কৌতূহল থাকে।

চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন্স পুরস্কার ঘোষণা করার জন্য হেড ম্যাডাম মাইক্রোফোনটা হাতে নিলেন, তারপর বললেন, “এখন আমাদের সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট পুরস্কার, এবারকার চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন্স! প্রত্যেক বছর আমরা এই পুরস্কারটা দিই যে নাকি লেখাপড়ার বাইরে অন্য কিছুতে সবার সেরা। ছেলেমেয়েদের কত রকম কোয়ালিটি থাকে, কেউ খেলাধুলায় ভালো, কেউ সাহিত্যে, কেউ সংগীতে, কেউ আবার চিত্রকলায়। আবার কেউ কেউ এর বাইরেও কোনো কিছুতে ভালো থাকে, আমরা যার খোঁজ রাখি না। এই বছর আমরা এই পুরস্কারটি দেব এমন একটি মেয়েকে যার বয়স মাত্র তেরো কিন্তু তার মায়ের অকালমৃত্যুর পর সে একা তার বাবা, তার ভাই-বোনের সবার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। আমরা নাচ গান আবৃত্তি খেলাধুলা কিংবা লেখাপড়া এই ধরনের গুণের কথা জানি, কিন্তু ছোট একটি মেয়ে পুরো পরিবারকে রক্ষা করার মতো অসাধারণ একটা কাজ করে যাচ্ছে, আমরা তার খোঁজ রাখি না!”

সমস্ত ছেলেমেয়ে হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেল। হেড ম্যাডাম ডাকলেন, “আমি সপ্তম শ্রেণির সালমা রহমানকে এই বছরের চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন্স স্বর্ণ পদকটি নেওয়ার জন্যে মঞ্চে আহ্বান করছি।”

টুনি শান্তশিষ্ট মেয়ে, সাধারণত সে হইচই করে না। কিন্তু হঠাৎ তার কী হলো কে জানে, চিলের মতো শব্দ করে একটা চিৎকার

দিল। সালমা তার পাশেই বসে ছিল। তাকে দেখে মনে হলো সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে ফ্যালফ্যাল করে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। তারপর হঠাৎ করে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল।

টুনি তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, ফিসফিস করে বলে, “বলেছিলাম না তোকে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে! বলেছিলাম না?”

তারপর তাকে দাঁড় করিয়ে টেনে টেনে মঞ্চের দিকে নিতে থাকে।

প্রায় হাজার খানেক ছেলেমেয়ে প্রথমে নিঃশব্দে বসে থাকে। তখন হঠাৎ একজন হাততালি দিল, তারপর আরেকজন তারপর আরও কয়েকজন। তারপর পুরো হল ঘরের সবাই হাততালি দিতে থাকে, সেই হাততালি থামতেই চায় না।

টুনি সালমাকে টেনে নিতে নিতে ফিসফিস করে বলে, “চোখ মুছে ফ্যাল বোকা মেয়ে। তোর আঁশু ওপর থেকে দেখছেন!”

সালমা চোখ মুছল।